আল্লামা তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ
মুফতি মুহাম্মাদ রাশিদ ডাসকবি

আকাবিরে দেওবন্দের

সোনালী অতীত

ভাষান্তর
মুহিব্বুল্লাহ খন্দকার

আকাবিরে দেওবন্দের

সোনালী অতীত

মূল

আল্লামা তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ

মুফতি মুহাম্মাদ রাশিদ ডাসকবি

অনুবাদ

মুহিব্বুল্লাহ খন্দকার

প্রকাশনায়

গ্রন্থাগার

নায়াফ কমপ্লেক্স, ৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৭৬৬৫৩৮৯৭২

বই : আকাবিরে দেওবন্দের সোনালি অতীত

লেখক : মুফতি তাকি উসমানি

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশকাল : মে ২০২৪

প্রচ্ছদ : ইলিয়াস বিন মাজহার

বর্ণবিন্যাস : রাহে জান্নাত কম্পিউটার্স

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com, wafilife.com, boiferry.com

মুদ্রিত মূল্য : ১৮০৳

সূচিপত্র

আল-ইহদা

- সেসব খোদাভীরু প্রকৃত আলেমদের প্রতি; যারা নিজেদের জীবনকে উম্মাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন, ইলম ও আমল প্রচার করার জন্য করে গেছেন আজীবন মেহনত।

- সেসব সত্যের পতাকাবাহী মুজাহিদদের প্রতি; যারা দীনের কালিমা বুলন্দ করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন যুদ্ধের এক ময়দান থেকে আরেক ময়দানে।

- সেসব তালিবুল ইলম ভাইদের প্রতি; যারা জাগতিক কোনো মোহ নয় বরং কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দীনি ইলম শিক্ষা করছে।

- সেসব মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের প্রতি; যারা নিজেদের সন্তানকে মাদরাসায় পড়ান এই আশায় যে, মৃত্যুর পর আমার আসল সম্বল হবে আমার এই সন্তান।

আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন?

আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন? এর জবাব সংক্ষিপ্ত কথায় এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, তারা ছিলেন খায়রুল কুরুনের স্মৃতি, সালাফে সালেহিনের নমুনা, ইসলামি ভাবধারার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে বসে গেলে এর জন্য বইয়ের পর বই লিখে ফেললেও যথেষ্ট হবে না। আর সত্য কথা হলো, তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি শব্দ ও বাক্যের গাঁথুনিতে নিয়ে আসা কঠিনই নয় শুধু, বরং তা প্রায় অসম্ভব।

কারণ তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি ছিল মূলত সেই স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত, যা সাহাবায়ে কেরামের জীবন ও তাদের জীবনপদ্ধতির আলোয় আলোকিত। আর স্বভাব ও প্রকৃতি এমন জিনিস যা অনুভব তো করা যায়, কিন্তু শব্দের মাধ্যমে সঠিকভাবে বর্ণনা করা যায় না। যেমন গোলাপ ফুলের সুঘ্রাণ অনুভব করা যায় কিন্তু এর সম্পূর্ণ অবস্থা শব্দের ছাঁচে ঢালা সম্ভব হয় না। ঠিক অনুরূপ ওই সকল বুজুর্গদের মেজাজ ও তবিয়ত তাদের সাথে সোহবত অর্জন ও ঘটনাবলির মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে, কিন্তু তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তাই এই প্রবন্ধে আকাবিরে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা তাত্ত্বিকভাবে আলোচনা না করে তাদের কিছু ঘটনা শোনানো উদ্দেশ্য। ঘটনাবলির মাধ্যমে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আরো ভালোভাবে বুঝে আসবে। আল্লাহর তাওফিক।

যদি শুধু বিস্তৃত মুতালাআ, কঠিন যোগ্যতা ও বেশি জ্ঞান-বিজ্ঞান জানার নাম ইলম হয়, তাহলে এই গুণ আজও ততটা সফলতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু আকাবিরে দেওবন্দের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, ইলম ও হিকমতের সমুদ্র সীনায় ধারণ করে নেওয়ার পরেও তাদের ইখলাস ও নিষ্ঠা, বিনয়-নম্রতা ছিল ঈর্ষণীয়। প্রচলিত একটি প্রবাদ রয়েছে:

پھلوں سے لدی ہوئی شاخ ہمیشہ جھکتی ہے

"ফলে ভরা ডাল সবসময় ঝুঁকে থাকে"।

তবে আমাদের যুগে এই কথায় জীবন্ত নমুনা আকাবিরে দেওবন্দের মধ্যে যতটুকু পাওয়া যায় অন্য কোথাও তা পাওয়া যায় না। কয়েকটি ঘটনার আঙ্গিকে দেখুন:

(১) দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম হজরত মাওলানা কাসেম নানুতুভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইলম ছিল কূলহীন সাগরের মতো। স্বীয় রচনাবলি যেমন আবে হায়াত, তাকরীরে দিলপযীর, কাসিমুল উলুম আর মুবাহাসায়ে শাহজাহানপুর ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর ইলমের মাকাম ও স্তর কিছুটা অনুমান করা যায়। আর এসব রচনাবলির মধ্যে এমনকিছু রচনাও রয়েছে, যা জাইয়েদ আলেমগণ বুঝতেও হিমশিম খেয়ে যায়।

তাঁর সমসাময়িক বুযুর্গ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব নানুতভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর এই কথা প্রসিদ্ধ আছে, "আমি আবেহায়াত ছয়বার পড়েছি। এখন তা অল্প অল্প বুঝে এসেছে।"

আর হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি সাহেব থানভি রহমাতুল্লাহি বলতেন:

"এখনও মাওলানা নানুতুভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর রচনাগুলো আমার বুঝে আসে না। আর বেশি কষ্ট সহ্য করার মতো লোক আমি নই। সেজন্য তাঁর রচনা থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত। আর নিজ অন্তরকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে থাকি যে, প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করার জন্য আরো সহজ সহজ কিতাবাদি যেহেতু রয়েছে, তাহলে এত কষ্ট কেন করতে যাবো?"[১]

এত বিস্তৃত ও গভীর ইলম থাকার পরেও, বিশেষত যখন এসব বিদ্যার মধ্যে যুক্তিবিদ্যার প্রাধান্য থাকে, তখন সাধারণত জ্ঞান ও অনুগ্রহের একটি মহৎ প্রতিচ্ছবি জন্ম নেয়, কিন্তু হযরত নানুতুভির অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি নিজেই বলেছেন:

"সুফীদের মধ্যে যেমন আমার বদনাম হয়েছে, তেমনি মৌলবি হওয়ার দাগও আমার গায়ে, তাই আমাকে বুঝে শুনে পদক্ষেপ নিতে হবে। যদি মৌলবি হওয়ার দাগ না লেগে যেত তাহলে কাসিমের ধূলিকণার ব্যাপারেও কেউ জানতে পারত না।"[২]

সুতরাং তার নিঃস্বার্থতা ও নম্রতার এই অবস্থা ছিল, মাওলানা আহমাদ হাসান সাহেব আমরুহি রহমাতুল্লাহি আলাইহির বক্তব্য মোতাবেক:

"হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতভি [রাহ.] যে তালিবে ইলমের মধ্যে অহঙ্কার ও তাকাব্বুর দেখতে পেতেন, তার মাধ্যমে কখনো কখনো জুতা উঠাতেন। আর যার মধ্যে বিনম্রতা দেখতেন তার জুতা তিনি নিজে উঠিয়ে নিতেন।"[৩]

(২) ঠিক এমন অবস্থা ছিল মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহি [রহ.] -এর। তাফাক্কুহ ফিদ-দীনের ব্যাপারে তার উচ্চ মর্যাদার কারণে হযরত মাওলানা

---

১ আশরাফুস সাওয়ানিহ: ১/১৩৬-১৩৭
২ আরওয়াহে ছালাছা: ১৭৬ নং ২৩০
৩ প্রাগুক্ত: ২০৬, নং ২৮৮

নানুতুভি তাঁকে 'আবু হানিফায়ে আসর' অর্থাৎ যুগের আবু হানিফা উপাধি দিয়েছিলেন। আর তিনি স্বীয় যুগে এ উপাধিতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি যেখানে আল্লামা শামি রহমাতুল্লাহি আলাহির মতো মহান মুহাক্কিক ব্যক্তিকে 'ফকীহুন নফস' উপাধি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি হযরত মাওলানা গঙ্গুহি [রাহ.] কে 'ফকীহুন নফস' বলতেন।

তাঁর ব্যাপারে মাওলানা আশরাফ আলি থানভি [রহ.] ঘটনা শোনান:

হযরত মাওলানা গঙ্গুহি রহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার হাদিসের সবক পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। ছাত্ররা সবাই কিতাবাদি নিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেল। কিন্তু মাওলানা সাহেব ছাত্রদের জুতা জমা করতে লেগে গেলেন, যাতে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মানুষেরা এই অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।[৪]

(৩) শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইলম ও হিকমতের আজব নমুনা ছিলেন। কিন্তু হযরত থানভি [রহ.]-বলেন: একবার তিনি মুরাদাবাদ গেলেন। সেখানকার মানুষ তাঁকে ওয়াজ নসিহত করার জন্য জোরাজুরি করতে লাগল। মাওলানা সাহেব [রহ.] উজর পেশ করলেন যে, আমার ওয়াজ নসিহত করার অভ্যাস নেই। কিন্তু মানুষেরা নাছোড়বান্দা। তাদের জোরাজুরিতে অবশেষে ওয়াজ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন আর, 'فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد' হাদিসটি পাঠ করলেন। আর তরজমা করলেন, "একজন আলেম শয়তানের উপর হাজার দরবেশের চেয়ে ভারী"।

---

৪ প্রাগুক্ত: ২৮৬, নং ৪৩৬

সেই মজলিসে প্রসিদ্ধ একজন আলেম বসা ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন: "এই তরজমা ভুল। আর যে ব্যক্তি তরজমা সঠিকভাবে করতে জানে না, ওয়াজ করা তার জন্য জায়েজ নয়।"

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর প্রতিক্রিয়া জানার পূর্বে আমাদের একটু সময় নিয়ে চিন্তা করা উচিত, যদি তাঁর জায়গায় আমরা থাকতাম তাহলে কী করতাম? তরজমা তো ঠিকই ছিল, কিন্তু ওই ব্যক্তির কথা বলার ধরন অপমানজনক নয় বরং উত্তেজকও ছিল।

যাহোক থানভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, এ কথা শোনার পর শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বসে গেলেন এবং বললেন যে, আমি তো প্রথমেই বলেছি, আমি ওয়াজ করার যোগ্য নই। কিন্তু এই লোকগুলো আমার কথা শুনলো না। আচ্ছা, এখন আমার কাছে ওজর পেশ করার জন্য দলিলও রয়েছে। অর্থাৎ, আপনার সাক্ষ্য।"

সুতরাং ওয়াজ-নসিহত তো প্রথমবারেই শেষ করে দিলেন। এরপর তিনি ওই আলেমের কাছ থেকে ইস্তেফাদা নেওয়ার সুরতে জিজ্ঞেস করলেন: "আমার ভুলটা কী, বলে দিন। যাতে ভবিষ্যতে এমন ভুল থেকে বেঁচে থাকতে পারি।" ওই আলেম সাহেব বললেন: "'اَشَدُّ' এর তরজমা 'اَثْقَلُ' বেশি ভারী নয়। বরং এর তরজমা হলো 'اَضَرُّ' বেশি ক্ষতিকারক।"

মাওলানা শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই সাথেসাথে বললেন: "হাদিসুল ওয়াহির মধ্যে এসেছে, 'يَأْتِيْنِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ' অর্থাৎ, কখনো আমার ওপর ঘন্টাধ্বনির আওয়াজের ন্যায় অহি আসে। আর আমার ওপর সবচেয়ে ভারী হয় সেই

পদ্ধতিতে অহি আসা। অতএব, এখানেও 'اشْتَدَّ' কি 'أَضَرَّ' অর্থে ব্যবহার হয়েছে?" এ কথা শোনার পর ওই আলেম নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।[৫]

(৪) হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি [রহ.] যখন কানপুর মাদরাসায় পড়াতেন তখন তিনি মাদরাসার জলসায় স্বীয় উস্তাদ শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি-কেও দাওয়াত দেন। ওইসময় কানপুরে কয়েকজন আলেম যুক্তিবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল, আর কিছু বিদআতের দিকে ধাবিত ছিল। অন্যদিকে উলামায়ে দেওবন্দ যেহেতু খালেস দীনি ইলমের প্রচার প্রসারে থাকতেন, তাই ওইসকল যুক্তিবাদী আলেমরা মনে করত, উলামায়ে দেওবন্দ যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী নয়।

হযরত থানভি [রহ.] তখন যুবক ছিলেন আর শায়খুল হিন্দ [রহ.]-কে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে মনোবাসনা এটাও ছিল যে, এখানে হযরতের তাকরীর হলে উলামায়ে দেওবন্দের ইলমি মাকাম কেমন তা কানপুরের আলেমরা জানতে পারবে, জানতে পারবে তাদের যুক্তিবিদ্যা ও কুরআন হাদিসের জ্ঞান উভয় দিকে কী নিঁখুত দক্ষতা রয়েছে।

অতএব, যথাসময়ে জলসা শুরু হলো। হযরত শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র বক্তব্য শুরু হলো। কাকতালীয়ভাবে বক্তৃতার সময় যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা সামনে চলে আসে। থানভি রহ. যেসব যুক্তিবাদী আলেমদের শাইখুল হিন্দ-এর বয়ান শুনাতে চেয়েছিলেন তারা তখনও জলসায় আসেনি। যখন হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. এর বক্তব্যের সঠিক সময় আসলো আর তিনি যুক্তি তর্ক শাস্ত্রীয় মাসআলাগুলো খুব যুক্তিসহকারে বয়ান করছিলেন ঠিক

---

৫ আলোচ্য এই ঘটনাটি বিস্তারিতাকারে আমি আমার সম্মানিত পিতা মাওলানা মুফতি শফি সাহেব [রহ.]-এর কাছ থেকে শুনেছি। আর তিনি হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছ থেকে। আর এরই সারাংশ হযরত মিয়া সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'হায়াতে শায়খুল হিন্দ এর ১৬৭ নং পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন।

ওইসময়ই যুক্তিবাদী আলেমরা মজলিসে আসলো, যাদের অপেক্ষা করছিলেন থানভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

হযরত থানভি মনে মনে খুবই খুশি ছিলেন এই ভেবে যে, এখনই এসব লোকেরা শায়খুল হিন্দ রহ. এর ইলমি মাকাম ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে পারবে। কিন্তু হলো ভিন্ন কিছু। যখনই শায়খুল হিন্দ রহ. এসব আলেমদের দেখলেন, বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করে দিয়ে বসে গেলেন। হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেব গঙ্গুহি রাহ. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন:

"হযরত! এখনই বয়ানের আসল সময়, আর আপনি বয়ান বন্ধ করে বসে গেলেন?"

শায়খুল হিন্দ রহ. জবাবে বললেন: "হ্যাঁ! এই খেয়াল আমারও এসে গিয়েছিল।"

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-র একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে, কোনো ইহুদি তাঁর সামনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে গোস্তাখি করেছিলো। তখন তিনি তার ওপর লুটিয়ে পড়েন এবং তাকে জমিনে ফেলে দিয়ে বুকের ওপর চড়ে বসেন। এখন ইহুদি নিজেকে অসহায় মনে করে রেগে গিয়ে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেল যে, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসছেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, প্রথমে আমি রাসুল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এর মহব্বতের ভিত্তিতে ইহুদির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। কিন্তু থুথু নিক্ষেপ করার পর আমি যদি কিছু করতাম তাহলে সেটি হতো আমার বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. তাঁর এ কাজের মাধ্যমে হযরত আলি রাদিঃ এর সেই সুন্নাতকে জিন্দা করলেন। অর্থাৎ, এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাকরীর করছিলেন

খালেস আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কিন্তু শুধু দেখানো [illegible] করলে তা হলো নিজের ইলম দেখানোর উদ্দেশ্যে। তাই তিনি থেমে গেলেন।

(৫) মাদরাসায়ে মুঈনিয়া আজমিরের প্রসিদ্ধ মাওলানা মুঈনুদ্দিন সাহেব আজমেরী যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী মুসলিম আলেম ছিলেন। তিনি শায়খুল হিন্দ রহ. এর প্রসিদ্ধি শোনার পর তাঁর সাথে সাক্ষাত করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাই তিনি একবার দেওবন্দ তাশরিফ নিয়ে গেলেন এবং শায়খুল হিন্দ রহ. এর বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। গ্রীষ্মকাল ছিল। সেখানে এক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যিনি শুধুমাত্র গেঞ্জী ও লুঙ্গি পরিহিত ছিলেন। মাওলানা মুঈনুদ্দিন সাহেব রহ. তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন: "আমি মওলানা মাহমুদ হাসান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।"

তিনি মাওলানা আজমেরী (আল্লাহর বরকত দান করুন)-কে একটি উষ্ণ অভ্যর্থনা দিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন, তাকে আরামে বসিয়ে বললেন, এখন বৈঠক হয়ে গেছে।

মাওলানা আজমেরী রহ. অপেক্ষমাণ। এতটুকু সময়ে তিনি শরবত নিয়ে আসলেন এবং মাওলানাকে পান করালেন। এরপর মাওলানা আজমেরী বললেন: 'হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেবকে সংবাদ দিন।'

ওই ব্যক্তি বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আরামসে তাশরীফ গ্রহণ করুন। কিছুক্ষণ বাদে তিনি খানা নিয়ে এলেন এবং খাওয়ার জন্য জোরাজুরি করলেন। মাওলানা আজমেরী রহ. বললেন: "আমি মাওলানা মাহমুদ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছি, অথচ আপনি তাকে খবর দিন।"

---

৬ এই ঘটনাটি আমি আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতি শফি সাহেব রহ. এর কাছে শুনেছি। আর তিনি তার এক সহপাঠী আলেম মাওলানা মুগীছুদ্দীন সাহেবের কাছ থেকে শুনেছেন। যিনি দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে যুক্তিবিদ্যা পড়ার জন্য আজমীর চলে গিয়েছিলেন অবশেষে মদিনা তাইয়্যিবা হিজরত করেন। কিন্তু যেহেতু ঘটনা শোনার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই কয়েক বছর পূর্বে হযরত ওয়ালিদে মুহতারাম তাঁর কাছ থেকে এই ঘটনা সত্যায়ন করে নেন।

ওই ভদ্রলোক বললেন: "তাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আপনি খানা খান। এখনই তো সাক্ষাৎ হয়ে যাচ্ছে।"

মাওলানা আজমেরী রহ. খানা খাওয়া শেষ করলেন আর ওই ভদ্রলোক পাখা নিয়ে তাঁকে বাতাস দিতে শুরু করলেন। যখন দীর্ঘ সময় চলে গেল মাওলানা আজমেরী রহ. হতাশ হয়ে গেলেন। আর বললেন, আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন, আমি মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য এসেছিলাম আর এত দেরি হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিচ্ছেন না।

এ কথা বলার পর ওই ভদ্রলোক বললেন: "আসলে, এখানে কোনো মাওলানা নেই। তবে 'মাহমুদ' খাকসারের নামই।"

মাওলানা মঈনুদ্দিন সাহেব একথা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন এবং জানতে পারলেন যে, হযরত শায়খুল-হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি।[৭]

(৮) ইমামুল আসর আল্লামা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ সাহেব কাশ্মিরী রহ. ছিলেন ইলম ও প্রজ্ঞার দিক থেকে অনন্য ব্যক্তিত্ব। হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি সাহেব থানভি রহ. তার এক মজলিসে নকল করেন যে, জনৈক খ্রিস্টান দার্শনিক লিখে যে, "ইসলামের সত্যতার একটি প্রমাণ হল যে গাজ্জালী রহ. এর মতো একজন গবেষক ও পরীক্ষক, ইসলামকে সত্য বলে মনে করেন।"

এই কথা বলার পর হাকিমুল উম্মত রহ. বলেন:

"আমি বলি যে আমার সময়ে মাওলানা আনোয়ার শাহ্ সাহেবের অস্তিত্ব ইসলামের সত্যতার প্রমাণ যে, এমন একজন গবেষক ও তাত্ত্বিক আলেম ইসলামকে সত্য বলে মনে করেন এবং তাতে বিশ্বাস রাখেন।"[৮]

---

৭ হায়াতে আনওয়ার: ১১১ হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভি রহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।
৮ আনওয়ারে আনওয়ারী - লিখেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৩২

হযরত শাহ সাহেব [রহ.]-এর ব্যাপারে একটি ঘটনা পাওয়া যায়, যা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ারি সাহেব [রহমাতুল্লাহি আলাইহি] বর্ণনা করেছেন। তা হলো এই যে, ভাওয়ালপুর মুকাদ্দমার সময় যখন হযরত শাহ সাহেব [রহ.] কাদিয়ানীদের কুফরীর বিরুদ্ধে অসাধারণ ও জোরালো ভাষণ দিলেন আর তখন এটিও বললেন, 'ধর্মের মধ্যে যা তাওয়াতুরের সাথে প্রমাণিত নয়, তা পরিত্যাজ্য।' তখন কাদিয়ানিদের সাক্ষী এর ওপর প্রশ্ন তুলল যে: "তাহলে ইমাম রাযী-এর ওপর আপনারা কুফর ফতওয়া দিন। কারণ ফাওয়াতিহুর রহমুত শরহ মুসাল্লামুস সুবুত কিতাবে আল্লামা বাহরুল উলূম রহ. লিলেন যে, ইমাম রাযি রহ. 'মুতাওয়াতিরে মা'নুবী' অস্বীকার করেছেন।"

তখন সেখানে আলেমদের বিশাল সমাবেশ হয়েছিল, সবাই চিন্তিত ছিল। কারণ, ফাওয়াতিহুর রহমূত সাথে ছিল না তখন। তাহলে এই আপত্তির জবাব কীভাবে দেওয়া হবে?

মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ারি [রহ.] এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন: "আমাদের কাছে ওই কিতাবটি ছিল না। মাজাহিরুল উলূম সাহারানপুর-এর নাযিম সাহেব মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেব এবং মাওলানা মুর্তজা হাসান সাহেব [রহ.] চিন্তিত হয়ে ভাবছিলেন তারা কী উত্তর দেবেন?"

কিন্তু এই পেরেশান হালতের সময়ও হযরত শাহ সাহেবের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হলো: "জজ সাহেব! লিখুন, বত্রিশ বছর পূর্বে এই কিতাব দেখেছিলাম। এখন আমাদের কাছে কিতাবটি নেই। ইমাম রাজি রহ. মূলত বলেছেন যে, ' لاتجتمع امتى على الضلالة' এই হাদিসটি তাওয়াতুরে মা'নুবীর স্তরে পৌঁছেনি। সুতরাং তিনি শুধু এই হাদিসটি তাওয়াতুরে মা'নুবী হওয়াকে অস্বীকার করেছেন, তাওয়াতুরে মা'নুবীকে দলিল হিসেবে অস্বীকার করেননি। হাওয়ালা পেশ করার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ প্রতারণামূলক কাজ করেছেন। তাদেরকে ইবারত পড়তে বলুন, নইলে তাদের কাছ থেকে কিতাব নিয়ে পড়ছি।"

সুতরাং কাদিয়ানি সাক্ষী ইবারত পড়ল। আসলেই এর উদ্দেশ্য ছিল, যা হযরত শাহ সাহেব [রহ.] বলেছেন। মজলিসের মধ্যে নীরবতা ছেয়ে গেল। আর হযরত শাহ সাহেব [রহ.] বলেন:

জজ সাহেব! এই ভদ্রলোক আমাদেরকে নিরুত্তর করতে চান। আমি যেহেতু তালেবে ইলম, দুই চার কিতাব দেখে রেখেছি। আমি ইনশাআল্লাহ নিরুত্তর হবো না।[১]

দেখুন একদিকে ইলম ও ফযিলত এবং স্মৃতিশক্তির প্রখরতার দিক থেকে তাদের এমন অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল যে, বত্রিশ বছর আগে দেখা একটি কিতাবের একটি আংশিক অনুচ্ছেদ আশ্চর্যজনকভাবে স্মরণ ছিল। অপরদিকে, এই মজমায় অন্য কেউ থাকলে না জানি সে নিজেকে কত বড় ব্যক্তিত্ব দাবি করে বসত। কিন্তু, উপরের রেখা টানা বাক্যটি দেখুন, বিনয়-নম্রতার কোন স্তরে পৌঁছেছে? আর এ বিষয়টি শুধু কথাবার্তাতেই নয়, বাস্তবিকই তিনি এত গুণাগুণের অধিকারী হয়েও নিজেকে মামুলি তালেবে ইলম মনে করতেন। আর নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুআর প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত ছিলেন:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا.

হে আল্লাহ! আমাকে আমার নিজের চোখে ছোট এবং অন্যের চোখে বড় করুন।

(৬) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ারী [রাহ.] বর্ণনা করেন, একবার হযরত শাহ সাহেব রহ. কাশ্মির যাচ্ছিলেন। বাসের অপেক্ষায় শিয়ালকোট স্টেশনে অবস্থান করছিলেন।

এক পাদ্রি এসে বলতে লাগল, 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি মুসলমানদের বড় একজন আলেম।' শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতে লাগলেন: 'না!

১ প্রাগুক্ত: ৩৬

আমি তো একজন তালেবে ইলম মাত্র 'পাঁদ্রি বলল: 'ইসলামের ব্যাপারে আপনি জানেন?' শাহ সাহেব বললেন: 'কিছু কিছু জানি।'

তারপর তিনি তাদের ক্রুশের ব্যাপারে বললেন যে, 'তোমরা ভুল পথে আছো।' তারপর শাহ সাহেব নবিয়ে করিম [সা.]-এর নবুয়াতের ব্যাপারে চল্লিশটি দলিল পেশ করলেন। দশটি দলিল কুরআন থেকে, দশটি তাওরাত থেকে, দশটি ইনজিল থেকে এবং দশটি ছিল যৌক্তিক প্রমাণ।

শাহ সাহেবের বক্তব্য শুনে ওই পাদ্রি বলে উঠল, "আমার স্বার্থের প্রতি যদি খেয়াল না করতাম তবে একজন মুসলমান হয়ে যেতাম এবং আমি নিজেই আপনার কাছ থেকে আমার ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি।"[১০]

(৭) আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব [রহ.] বারবার এই ঘটনা শোনাতেন: যখন আমি দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসায় মোল্লা হাসান পড়াতাম তখন একদিন তার এবারতের মধ্যে কিছুটা ইশকাল তৈরি হয়; যার কোনো সমাধান হচ্ছিল না। আমি মনে করলাম, হযরত শাহ সাহেবের কাছে এর সমাধান চাওয়া উচিৎ। তাই আমি কিতাব হাতে নিয়ে হযরতের তালাশে বের হলাম। হযরত তার কামরায় ছিলেন না। হযরত তার নির্ধারিত স্থানে না থাকার মানে হলো, তিনি কুতুবখানায় অবশ্যই আছেন।

আমি কুতুবখানায় পৌঁছে দেখলাম তিনি কুতুবখানার উপরিভাগের গ্যালারিতে বসে মুতালায়ায় ব্যস্ত। আমি নীচে থাকতেই তিনি দেখে ফেললেন এবং সেখান থেকেই আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম যে, "মোল্লা হাসান কিতাবের এক স্থানে কিছু ইশকাল হচ্ছে। বোঝার প্রয়োজন ছিল।"

সেখানে বসে বসেই হযরত বললেন, "ইবারত পড়ুন।" আমি ইবারত পড়া শুরু করলে তিনি মাঝখানেই থামিয়ে দিয়ে বললেন: "আচ্ছা! তাহলে এখানে আপনার

১০ নাফহাতুল আনবার: ২৭ মজলিসে ইলমী করাচির ছাপা।

এই সন্দেহ হতে পারে।" এরপর সেই ইশকালের পুনরাবৃত্তি করলেন, যা আমার অন্তরে ছিল। আমি তার কথার সত্যায়ন করলাম যে, আসলেই এই ইশকাল হয়েছে। এর জবাবে তিনি সেখানে বসেই এমন তাকরীর করলেন যে, সকল ইশকাল সাথেসাথে দূর হয়ে গেল।

এখন এটা স্পষ্ট যে, হযরত শাহ সাহেব দীর্ঘকাল হাদিসের শিক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন এবং ফালসাফা ও যুক্তিবিদ্যার বইয়ের সাথে যোগাযোগ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এতকিছুর পরে এই মেধার প্রখরতা ও স্মরণশক্তি কুদরতের আজব কারিশমা নয় তো কি?

(৮) আমি আমার সম্মানিত পিতার নিকট শুনেছি আর শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব বানুরির কাছেও যে, হযরত শাহ সাহেব রহ ১৩১২ হিজরিতে আল্লামা ইবনুল হুমাম [রহ.] এর প্রসিদ্ধ হিদায়ার শরাহ 'ফাতহুল কাদীর' এবং তার তাকমিলা বিশ দিনের চেয়ে কিছু বেশি সময়ে মুতালাআ করে নিয়েছিলেন। আর কিতাবুল হজ্জ পর্যন্ত এর তালখীস লিখেছিলেন। আর তিনি সাহেবে হেদায়ার ওপর যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, সেগুলোর জবাবও লিখে দেন।

এরপর সারাজীবন আর 'ফাতহুল কাদীর' কিতাব দেখার প্রয়োজন পড়েনি। আর নতুন মুতালাআ ব্যতীত শুধুমাত্র বিষয়বস্তুই নয় বরং বড় বড় ইবারতের হাওয়ালা দরসের সময় সবকের মধ্যে দিতেন। হযরত মাওলানা বানুরি [রহ.] বলতেন যে, হযরত শাহ সাহেব [রহ.] ১৩৪৭ হিজরিতে আমাদেরকে এই ঘটনা বর্ণনা করেন আর বলেন:

"ছাব্বিশ বছর হয়ে গেছে তবুও আমার কিতাব দেখার প্রয়োজন পড়েনি। আমি যে আলোচনা করব, যদি তোমরা তা অধ্যয়ন করো তবে তফাত খুব অল্পই পাবে।"[১১]

(৯) হযরত মাওলানা মনযুর নুমানি সাহেব [রাহ.] হযরত শাহ সাহেব [রাহ.] এর শাগরেদ। তিনি বলতেন, দরস থেকে ফারাগাতের পর যখনই আমি শাহ সাহেবের খেদমতে হাজির হতাম, তখন পূর্বে থেকে লিখে রাখা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতাম।

একবার উপস্থিত হয়ে আমি তিরমিজি শরিফের এক ইবারতের হাওয়ালা দিলাম আর বললাম, এই ইবারতের মধ্যে ইশকাল, অনেক চিন্তা ফিকির করলাম, কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পেলাম না।

হযরত শাহ সাহেব বললেন, "মৌলবি সাহেব! আপনার মনে নেই। আমার খুব মনে আছে। যে বছর আপনি দাওরায় ছিলেন, ওইসময় আমি বলেছিলাম যে, তিরমিজির অধিকাংশ নুসখায় এখানে একটি ভুল রয়েছে। কিন্তু লোকেরা পাশ কাটিয়ে চলে যায় এবং লক্ষ্য করে না। অন্যথায় এই প্রত্যেকের কাছেই ইশকাল পয়দা হতো।" অতঃপর বললেন, "সহিহ ইবারত এরকম"।

মাওলানা মনযুর নুমানি লিখেন:

"আল্লাহু আকবার! তিনি মনে রাখতেন অমুক বছর ওই সময় সবকের মধ্যে এই আলোচনা করেছিলাম।"[১২]

(১০) হযরত মাওলানা কারী তাইয়্যিব সাহেব [রহ.] বলতেন যে, আমার লেখালেখির ক্ষেত্রে 'আবুল হাসান কাযযাব' এর জীবনীর প্রয়োজন ছিল। আমি তার জীবনী পাচ্ছিলাম না। সুতরাং যথারীতি হযরত শাহ সাহেব রহ. এর দরবারে

---

১১ হায়াতে আনওয়ার: ১০৯
১২ প্রাগুক্ত: ২২৫-২২৮

পৌঁছালাম। ওইসময় তিনি অন্তিম শয্যায় ছিলেন। যার দুই সপ্তাহ পরেই তিনি মারা যান। ওই অসুস্থতার সময়ে মারাত্মক পর্যায়ের দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। প্রাথমিক কথাবার্তার পর তিনি আসার উদ্দেশ্য শাহ সাহেবের কাছে বললে তিনি বলেন, আদব ও ইতিহাসের অমুক অমুক স্থান মুতালাআ করে নিন, পেয়ে যাবেন। একথা বলে তিনি আট দশটি কিতাবের নাম বললেন।

আমি বললাম যে, হযরত! এত কিতাবের নামও স্মরণে থাকবে না। এছাড়াও, ব্যবস্থাপনায় থাকার কারণে, কয়েকটি আংশিক দৃষ্টান্তের জন্য এত দীর্ঘ এবং বিস্তৃত মুতালাআ করার সময় নেই। এই ব্যক্তির মিথ্যা বলার প্রাসঙ্গিক ঘটনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত বলে দিন। আমি আপনার হাওয়ালায় জন্য আমি সেগুলিকে বইয়ের অংশ হিসেবে বানিয়ে নেবো।

একথা শুনে হাসিমুখে তিনি আবুল হাসান কাযযাবের জন্ম সাল থেকে তার বয়স অনুসারে ইতিহাস বর্ণনা করতে শুরু করেন, আর সেই আলোচনায় তিনি তার মিথ্যাচারের অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করতে থাকেন। অবশেষে মৃত্যু সন আলোচনার সময় বলেন যে, এ লোকটি মরতে মরতেও মিথ্যা বলে গিয়েছে। অতঃপর সেই মিথ্যার বর্ণনাও তিনি দেন।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে, তাঁর বর্ণনার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল হযরত শাহ সাহেব আজ রাতেই স্বতন্ত্রভাবে এই কিতাব মুতালাআ করেছেন। কারণ তিনি সাল অনুযায়ী ওই কাযযাবে ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। সুতরাং আমি আশ্চর্য হয়ে আরজ করলাম যে, 'মনে হচ্ছে নিকটবর্তী কোনো সময়ে আপনি তা মুতালাআ করেছেন।'

সরলভাবে তিনি বললেন, "জি না। আজ থেকে আনুমানিক চল্লিশ বছর হবে। আমি যখন মিসর গিয়েছিলাম তখন খেদিভ কুতুবখানায় মুতালার জন্য পৌঁছলাম। তখন সেখানে ঘটনাক্রমে আবুল হাসান কাযযাব-এর জীবনী সামনে এসে যায়। আর দীর্ঘক্ষণ মুতালাআ জারি ছিল। ওইসময় যে বিষয়গুলো কিতাবে দেখেছিলাম,

তা মুখস্থ হয়ে যায়। আর আজ আপনার প্রশ্ন করায় আমার স্মরণে আসলো, যা আমি এখন আপনাকে শুনালাম।"[১০]

(১১) হযরত মাওলানা কারী তাইয়্যিব সাহেব [রহ.] বলেন যে, খেলাফত আন্দোলনের সময় যখন ইমারতে শরিয়া (সাধারণ মুসলমানের পক্ষ থেকে কাজী নির্ধারণ) একটি ইস্যু হিসাবে উত্থাপিত হয়েছিল, তখন মৌলভী সুবহানুল্লাহ খান সাহেব নিজ দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে সালাফের কয়েকটি বক্তব্য পেশ করেন। যা তার দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করছিল, কিন্তু তা ছিল জমহুর উলামাদের মাসলাকের বিপরীত। সেই বক্তব্যগুলো নিয়ে তিনি নিজে দেওবন্দ যান এবং উলামাদের সামনে তা পেশ করেন। তারপর সকল উলামায়ে কেরাম হযরত শাহ সাহেব [রহ.]-এর কামরায় তাশরিফ নিয়ে গেলেন।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, ওইসব বক্তব্যগুলোর না কোনো জবাব দিতে পারছিলেন আর না সেগুলো সালাফের বড় কোনো ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে ছিল এবং বক্তব্যগুলো সরাসরি জমহুর মাসলাকের বিপরীত ছিল, যা সমর্থন করার মতো না। বক্তব্য এমন সুস্পষ্ট ছিল, যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তাবিল করার মাধ্যমেও জমহুরের মাসলাকে পক্ষে আনা যাবে না। হযরত শাহ সাহেব [রহ.] ইসতেনজার জন্য গেলেন। অজু করে ফিরে আসলে উলামাগণ সেই বক্তব্য এবং মাসলাকে বৈপরিত্য নিয়ে আলোচনা করলেন আর বললেন যে, এই দু'বিষয়ের মধ্যে সমতা হচ্ছে না।

হযরত শাহ সাহেব রহ. অভ্যাস অনুযায়ী 'হাসবুনাল্লাহ' বলে বসে গেলেন আর বক্তব্যটি একটু গভীরভাবে দেখে বললেন যে, এই ইবারতের মধ্যে 'جعل' অপব্যাখ্যা এবং 'تصرف' অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। সাথেসাথে তিনি কুতুবখানা থেকে কিতাব আনালেন। দেখা গেল ইবারতের মধ্যে আসলেই মাঝখান থেকে সম্পূর্ণ এক লাইন হযফ করে দেওয়া হয়েছে। যখনই সেই হযফকৃত লাইনটি জুড়ে

---

১০ প্রাগুক্ত: ২২৯, ২৩০

দেওয়া হলো সম্পূর্ণ ইবারত জমহুরের মাসলাকের পক্ষে চলে আসলো এবং সকলেই বিস্মিত হলো।[১৪]

(১২) হযরত মাওলানা ইউসুফ বানুরি [রহ.] বলেন যে, তালাকের এক মাসআলায় কাশ্মিরের আলেমদের মধ্যে ইখতেলাফ সৃষ্টি হয়ে গেল। দু'দলই হযরত শাহ সাহেব রহ. কে সালিস বানায়।

হযরত শাহ সাহেব রহ. উভয়ের দলিল-প্রমাণ মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন। তাদের মধ্য থেকে একদল ফতোয়ায়ে আম্মাদিয়ার একটি ইবারতের মাধ্যমে দলিল পেশ করছিল। শাহ সাহেব রহ. বললেন: "আমি দারুল উলূমের গ্রন্থাগারে ফাতাওয়া আম্মাদিয়ার একটি হাতে লেখা কপি মুতালাআ করেছি। সুতরাং এই ইবারতটি মোটেও নেই তাতে, তাই হয়তো তাদের নুসখাটি ভুল অথবা এই লোকেরা একটি বিভ্রান্তি তৈরি করছে।"[১৫]

যদি এমন ইলম ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং এই জাতীয় স্মৃতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তি নিজেকে উচ্চ মর্যাদাশীল দাবি করা শুরু করেন, তবে তিনি কোনো না কোনো দিক থেকে তার হক পৌঁছতে পারত। কিন্তু শাহ সাহেব [রহ.] ছিলেন সেই হেদায়াতি কাফেলার ব্যক্তি ছিলেন, যিনি 'مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ' হাদিসের বাস্তব চিত্র হয়ে দেখিয়েছেন।

সুতরাং ওই ঘটনার সময় যখন তিনি নিজের ফয়সালা লিখার জন্য হযরত মাওলানা বানুরি রহ. কে হুকুম দিলেন তখন তিনি শাহ সাহেবের নামের সাথে 'الحبر البحر' বিচক্ষণ আলেম দু'টি সম্মানসূচক শব্দ লিখতে চেয়েছিলেন তখন তিনি তা দেখার সাথে সাথে জোর করে কলম ছিনিয়ে নিয়ে শব্দদ্বয় মিটিয়ে দেন

১৪ নাফহাতুল আনবার: ২৭
১৫ হায়াতে আনওয়ার: ২৩৩

এবং রাগতস্বরে মাওলানা বানুরি [রহ.]-কে বললেন: "আপনি শুধু মাওলানা আনওয়ার শাহ লিখতে পারবেন।"[১৬]

তারপরও এমন ব্যক্তি; যিনি সর্বদা কিতাবের মধ্যে ডুবে থাকতেন, তার আদব ও সম্মানসূচক এই বক্তব্য কত উচ্চ মাকাম ও মর্যাদার আলামত বহন যে: "আমি মুতালাআয় কিতাবকে কখনোই আমার অনুগামী বানাইনি বরং সর্বদা নিজেকে কিতাবের অনুগামী বানিয়ে মুতালাআ করেছি।"

হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব সাহেব [রহ.] বলেন, "সফরে হোক বা নিজ স্থানে উপস্থিতিতে কখনোই দেখিনি যে, তিনি শুয়ে শুয়ে মুতালাআ করছেন কিংবা কিতাবের মধ্যে টেক লাগিয়ে মুতালাআয় ব্যস্ত হয়েছেন। বরং তিনি কিতাবকে সামনে রেখে আদবের সাথে বসতেন। যেন তিনি কোনো শায়খের দরসে বসে তার থেকে ইলম গ্রহণ করছেন।"

শাহ সাহেব রহ. বলতেন: "বোধসম্পন্ন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত দীনিয়াতের কোনো কিতাব বিনা অজুতে মুতালাআ করিনি।"[১৭]

(১৩) দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাসে এই বক্তব্যটি প্রসিদ্ধ ছিলো, দারুল উলুমের সূচনা এমন দু'জন ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে হয়, যাদের দু'জনের নামই ছিল মাহমুদ। আর দুজনে দেওবন্দ শহরের অধিবাসী ছিলেন।

তাদের মধ্যে তালিবে ইলম তো ছিলেন সেই মাহমুদ, যিনি শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান [রহ.] নামে প্রসিদ্ধ আর উস্তায যিনি ছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত মোল্লা মাহমুদ সাহেব [রহ.]

আমার সম্মানিত দাদা মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসিন সাহেব [রহ]. বলেন, একবার মোল্লা মাহমুদ সাহেব [রহ.] বলেন, সুনানে ইবনে মাজাহ-এর যে হাশিয়া হযরত

---

১৬ প্রাগুক্ত: ২৩৩
১৭ মেরে ওয়ালেদে মাজেদ' হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি সাহেব: ৫৪-৫৫

শাহ আবদুল গনি মুহাদ্দিসে দেহলভি সাহেব [রহ.]-এর নামে ছাপা হয়েছে, তার বড় একটি অংশ হযরত শাহ আবদুল গনি সাহেব আমার মাধ্যমে লিখিয়েছেন।

তার এমন সরলতা ছিল যে ছাত্ররা এ কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। কারণ ছিল যে, ইলমে দাবি করা আর সুনাম-সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা থেকে আল্লাহপাক তাকে এই ফেরেশতা তুল্য বুযুর্গকে এমনভাবে পবিত্র রেখেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য চেনা মুশকিল ছিল যে, তিনি এত বড় একজন আলেম।

নিজ ঘরের বাজার নিজে করে আনতেন আর বাড়ির সাধারণ একজন ব্যক্তির মতো দিন অতিবাহিত করতেন। কিন্তু ইলমী দিক থেকে এত মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন যে, আমার দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসিন সাহেব [রহ.] বড় এক কিতাব (যথাসম্ভব সেটি মানতিক অথবা উসুলে ফিকহের কিতাব ছিল) যা তাঁর দরসের বাইরে থেকে গিয়েছিল। তার চিন্তা ছিল দাওরায়ে হাদিস শরিফের পূর্বে এই কিতাব সম্পূর্ণ পড়তে হবে। সুতরাং তিনি মোল্লা মাহমুদ সাহেব রহ.-এর কাছে তা পড়ানোর আবেদন জানালেন। মোল্লা সাহেব রহ. বললেন যে, মাদরাসার ঘণ্টা ব্যতীত আমার সম্পূর্ণ সময় সবক পড়ানোতেই ব্যয় হয়। শুধু একটা সময় বাকি থাকে, যখন আমি ঘরের গোশত ও তরকারি কেনার জন্য বাজারে যাই। এই সময়টা শুধু খালি থাকে। তুমি সঙ্গে থাকলে তখন সবক পড়িয়ে দেবো।

আমার দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসিন সাহেব [রহ.] বলেন যে, সেই কিতাবটি যথেষ্ট বড় এবং দুর্বোধ্য ছিল, যা অন্যান্য ভালো ভালো আলেমদের জন্যে গভীর মুতালাআ ও চিন্তাফিকির করার পরেও পড়াতে কষ্ট হতো। কিন্তু মোল্লা মাহমুদ সাহেব রহ. কিছু সবক রাস্তায়, কিছু সবক কসাইয়ের দোকানে

পড়িয়ে সম্পূর্ণ কিতাব এমনভাবে পড়িয়ে দিয়েছেন যে, কোনো কাঠিন্য দেখতে পাইনি।[১৮]

(১৪) হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আলি থানভি [রহ.] এর ইলম ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কিছু বলা মানে হলো, সূর্যকে বাতি দেখানোর মতো। হজরত থানভি ছাত্রজীবন থেকেই ইলমী যোগ্যতা, বিদ্যা-বুদ্ধিতে অনন্য ছিলেন, ইলম ও আমলে ব্যস্ত ছিলেন।

কিন্তু ১৩০০ হিজরিতে যখন তিনি দারুল উলুম থেকে ফারেগ হন আর দস্তারবন্দির জন্য দেওবন্দে অনেক বড় ও শানদার জলসার আয়োজনের প্রস্তাব পেশ করা হয়, তখন থানভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ সহপাঠীদের নিয়ে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব নানুতভি সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে হাজির হয়ে বলেন: "হযরত! আমরা শুনতে পেলাম, আমাদেরকে দস্তারবন্দি করা হবে আর ফারেগ হওয়ার সনদ দেওয়া হবে। অথচ আমরা এর যোগ্য কখনোই নই। সুতরাং এই প্রস্তাবনা বাতিল করা হোক। যদি এমন করা হয়, তাহলে মাদরাসার অনেক বড় বদনামী হয়ে যাবে যে, এমন অযোগ্যদেরও সনদ প্রদান করা হয়েছে।"

হযরত নানুতভি [রহ.] একথা শুনে একথা শুনে জোশ এসে যায়, তিনি বলেন, তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যেহেতু তোমাদের উস্তাদরা এখানে আছেন, তোমরা তাদের সামনে নিজেদের ব্যক্তিত্ব দেখতে পাবে না আর এটি এমনই হওয়া উচিত। বাহিরে গেলে তোমরা নিজেদের মর্যাদা ও কদর দেখতে পাবে, যেখানেই যাবে দেখবে তোমাদেরই জয়গান।[১৯]

---

১৮ আরওয়াহে ছালাছা: ১৪৮ নং ১৮৮
১৯ প্রাগুক্ত: ১৫৩ নং ১৯৭

সরলতা ও আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি তাদের ধ্যান-ধারণা

(১৫) দেওবন্দের অন্যতম একজন আকাবির হলেন মাওলানা মুযাফফর হুসাইন কান্ধলবি রহ.। তাঁর ইলম ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুমান এভাবে করা যায় যে, তিনি হলেন হযরত শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-র সরাসরি ছাত্র আর হযরত শাহ আবদুল গনি সাহেব মুহাদ্দেসে দেহলভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র সহপাঠী।

তিনি একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ হলো, যিনি মাথায় বোঝা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বোঝা অনেক ভারী ছিল, যা নিতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল।

হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই অবস্থা দেখে বৃদ্ধ লোকটির কাছ থেকে বোঝাটি নিয়ে নিলেন এবং যেখানে যেতে চান সেখানে পৌঁছে দেন। ওই বৃদ্ধ লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল: "তুমি কোথাকার বাসিন্দা!" তিনি বললেন: "আমি কান্ধালার অধিবাসী।" বৃদ্ধ লোকটি বলল: "সেখানে মৌলভি মুযাফফর হুসাইন নামে বড় একজন অলি আছে।" একথা বলে বৃদ্ধ লোকটি মাওলানা মুযাফফর হুসাইন কান্ধলভি সাহেবের অনেক প্রশংসা করলেন।

কিন্তু মাওলানা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: "আরে তার মাঝে তেমন কিছু নেই। হ্যাঁ নামাজ তো পড়ে নেয়।"

বৃদ্ধ লোকটি বলল: "আরে মিয়া! তুমি এমন বুযুর্গের ব্যাপারে এমন সব কী বলছ?" মাওলানা সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: "ঠিক বলছি আমি।" এ কথা শুনে ওই বৃদ্ধের কাছে খারাপ লাগল। ইতোমধ্যে অন্য একজন ব্যক্তি চলে আসলো, যে মাওলানা সাহেবকে চিনতেন। সে ওই বৃদ্ধকে বলল যে,

"আরে ভদ্রলোক! মৌলভি মুযাফফর হুসাইন তো ইনিই।" একথা শোনার পর বৃদ্ধ লোকটি মাওলানা সাহেবকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে লাগলেন।[20]

(১৬) এই মুযাফফর হুসাইন সাহেব [রহ.]-র অভ্যাস ছিল যে, তিনি এশরাকের নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হতেন আর সকল আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গমন করতেন। আবো কোনো বাজার আনার প্রয়োজন হলে জিজ্ঞেস করে এনে দিতেন। আর দুর্লভ সেই যুগে মানুষের কাছে টাকা পয়সা কম থাকত। সাধারণত মানুষ শস্যের বিনিময়ে কেনাবেচা করত। সুতরাং তিনি ঘর থেকে শস্য বেঁধে মাথায় করে নিয়ে যেতেন এবং সেগুলোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করে এনে দিতেন।[21]

(১৭) অনুরূপ অবস্থা ছিল মুফতিয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতি আযিযুর রহমান সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর। তাঁর ইলম ও শ্রেষ্ঠত্ব এই ছিল যে, আজ তাঁর 'আযীযুল ফাতাওয়া' সমকালীন সকল মুফতিদের উৎস হয়ে আছে আর ফাতাওয়ার সাথে তার এতটাই সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, মৃত্যুর সময়ও একটি ইসতিফতা তাঁর হাতে ছিল। যাকে মৃত্যুই হাত থেকে ছিনিয়ে বুকের মধ্যে রেখে দিয়েছিল।[22]

কিন্তু সরলতা, বিনয়-নম্রতা এবং সৃষ্টির সেবার ক্ষেত্রে তার অবস্থা এমন ছিল যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি সাহেব রহ. বলেন:

"মানুষ কীভাবে বুঝতে পারবে যে, তিনি এত বড় সুফি ও কেরামতের অধিকারী ব্যক্তি এবং সাহেবে নেসবত শায়খ, অথচ বিনয় ও নম্রতা এবং সরলতার কেমন দৃষ্টান্ত ছিল যে, শুধুমাত্র নিজ ঘরের সওদাপাতি বাজার থেকে আনতেন তা নয়, বরং মহল্লার বিধবা ও আর্তদের সওদাপাতি নিজে এনে দিতেন। বোঝা বেশি হয়ে

---

২০ নুকুশ ওয়া তাআছছুরাত-হযরত মুফতি শফি: ৩৪
২১ মুকাদ্দামায়ে ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ: ১/৪৩
২২ নুকুশ ওয়া তাআছছুরাত: ৪০

বগলদাবা করে নিয়ে আসতেন। অতঃপর প্রত্যেকের ঘরের সওদা হিসাকসহ পাঠিয়ে দিতেন।"[২৩]

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি সাহেব রহ. এর মুখেই শুনেছি যে, তিনি বলেছেন: "যখন তিনি কোনো মহিলার কাছে তার সওদা নিয়ে যেতেন তখন কেউ বলত, 'মৌলভি সাহেব! আপনি তো ভুল করে ফেলেছেন। আমি তো এই জিনিস এত বেশি পরিমাণে চাইনি'। তারপর তিনি আবারো বাজারে যেতেন এবং মহিলার অভিযোগ করতেন।"

(১৮) হযরত মাওলানা সাইয়িদ আসগার হুসাইন সাহেব [রহ.] দেওবন্দে মিয়া সাহেব উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দের উচ্চ স্তরের উস্তাদ ছিলেন। তাঁর কাছে আবু দাউদ শরিফ পড়েছেন এমন ছাত্র এই উপমহাদেশে হাজার হাজার রয়েছে। উলুমুল কুরআন ও উলুমুস সুন্নাহে যথেষ্ট পারদর্শী এবং সকল শাস্ত্রের বিদ্যায় কামেল মুহাক্কিক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত অল্প কথা বলতেন, হাদিসের দরসে খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ আলোচনা করতেন। যাতে করে হাদিসের মর্ম অন্তরের ভেতর বসে যেত এবং কোনো সন্দেহ সংশয় থাকলে নিজ থেকেই দূর হয়ে যেত।

তাঁরই একটি ঘটনা আছে যে, তাঁর অন্দরমহল এবং বসার ঘর কাঁচা মাটির তৈরি ছিল। প্রতিবছর বর্ষার মৌসুমে তা প্রলেপ দেওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে যেত। আর এতে অনেক টাকা পয়সা খরচ হতো। একবার আমার পিতা (মাওলানা মুফতি শফি সাহেব) হযরত মিয়া সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে বললেন:

"হযরত! এই ঘরের প্রলেপ দেয়ায় সারাবছর যা ব্যয় হয় সেই পরিমাণ অর্থ যদি শক্তপোক্ত ইট দিয়ে ঘর বানানোতে খরচ করেন তাহলে দুতিন বছরে এই খরচ সমান হয়ে যাবে। এবং সবসময় কষ্ট করা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।"

---

২৩ মাসিক পত্রিকা "আলবালাগ" রবিউস সানী ১৩৮৭ সংখ্যা পৃঃ ৩৮-৩৯ খণ্ড: ১ আলোচ্য বিষয়, "হযরত মিয়া সাহেব রহ"।

একথা শুনে প্রথমে তো তিনি বললেন: "মাশাআল্লাহ! কথা তো অনেক বুদ্ধির বললেন। আমরা বৃদ্ধ হয়ে গেলাম, অথচ এদিকে ধ্যানই আসলো না।" অতঃপর সামান্য বিরতি দিয়ে বাস্তব অবস্থা যা তা তিনি বললেন। আর তখনি জানা গেল যে, হযরত কেমন ভালো চিন্তা তিনি করেন? তিনি বললেন: "আমার প্রতিবেশী সবার ঘর কাঁচা। আমি যদি ঘর পাকা বানিয়ে ফেলি তাহলে গরিব প্রতিবেশী সবাই হিংসা করবে। আর আমার এত সামর্থ্য নাই যে, তাদের সবাই ঘর পাকা বানিয়ে দেবো।"

সম্মানিত পিতা হযরত শফি সাহেবের বক্তব্য:

"ওই সময় জানা গেল, হযরত যে উঁচু চিন্তা করতেন, সেই পর্যন্ত যে কেউ পৌঁছুতে পারে না। সুতরাং তিনি ততদিন পর্যন্ত তার ঘরকে পাকাপোক্ত করেননি যতদিন পর্যন্ত প্রতিবেশীদের ঘর পাকা না হয়।"[২৮]

(১৯) হযরত মিয়া সাহেব রহ. এর আরেকটি ঘটনা, একবার আমার হযরত পিতা তাঁর ঘরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। তখন তিনি আমের মেহমানদারি করালেন। তখন তারা যখন আম খেয়ে শেষ করলেন তখন আমার ওয়ালেদ সাহেব রহ. আমের আঁটি ও খোসা ভরতি টুকরি বাহিরে ফেলে দেওয়ার জন্য চললেন। হযরত মিয়া সাহেব রহমাতুল্লাহি দেখে জিজ্ঞেস করলেন: "এই টুকরি কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?" সম্মানিত পিতা বললেন: "এগুলে বাহিরে ফেলে দেওয়ার জন্য যাচ্ছি।" তিনি বললেন: "ফেলতে পারো কি না?"

পিতাজি বললেন: "হযরত! এই খোসা ফেলার জন্য বিশেষ শাস্ত্র আছে নাকি, যা শেখার প্রয়োজন?"

হযরত বললেন: হ্যাঁ! তুমি সেই শাস্ত্র জানো না। নাও, আমাকে দাও।

২৮মাসিক 'আলবালাগ' রবিউস সানি ১৩৮৭ হিজরি পৃঃ ৩১ খণ্ডঃ ১

তিনি নিজে টুকরি নিয়ে প্রথমে আমের খোসাগুলো আঁটি থেকে আলাদা করলেন। এরপর বাহিরে গেলেন এবং রাস্তার কিনারায় অল্প অল্প দুরত্বে নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে খোসাগুলো রেখে দিলেন আর এক নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে ফেলে দিবেন। সম্মানিত পিতা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: "আমাদের ঘরের নিকটে আশেপাশে সকল গবির ও মিসকিনরা থাকে। বেশিরভাগ মানুষ এমন আছে, যারা জবের রুটিও খুব কষ্টে পায়। যদি তারা ফলের খোসাগুলো একসাথে এভাবে দেখে ফেলে তখন নিজের অসহায়ত্ব ও অসচ্ছলতার প্রতি আফসোস করবে এবং দারিদ্র্যের কারণে আফসোস করবে। আর এই কষ্ট দেওয়ার কারণ আমি হতে পারি, তাই এগুলো আলাদা আলাদা করে ফেলে দিলাম, এবং সেগুলো এমন স্থানে যেখান দিয়ে জন্তু জানোয়ারের দল চলাফেরা করে। আর এই খোসাগুলো পশু - পাখির কাজে আসে। আর আঁটিগুলো এমন জায়গায় ফেলে দিয়েছি, যেখানে বাচ্চারা খেলাধুলা করে। তারা এই আঁটিগুলো ভুনা করে খেয়ে ফেলে। প্রকৃতপক্ষে এই খোসা ও আঁটিগুলোও একেকটি নিআমত। এগুলো নষ্ট করে ফেলাটা মুনাসিব নয়।"

আমার ভাই মরহুম মাওলানা যাকী কাইফী সাহেব, যিনি তখন ছিলেন, তিনি লিখেন: "এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মিয়া সাহেব নিজে হয়ত কোনো কোনো সময় খেয়েছেন। সাধারণত মেহমানদের জন্যই হতো।"[২৮]

•••

(২০) এই মিয়া সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর নিয়মিত আমল ছিল, যে খানা ঘর থেকে আসত, তিনি নিজে তা খুব কম তো খেতেন আর বাকি খানা শিশুদের খাইয়ে দিতেন। যে খাবার অবশিষ্ট থেকে যেত, তা বিড়ালের জন্য দেয়ালের ওপর রেখে দিতেন। যে টুকরা থেকে যেত তা ছোট ছোট করে পাখিদের

---

২৮ এই ঘটনাটি আমি আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলান মুফতি শফি সাহেব রহ. এর কাছ থেকে শুনেছি। আর তিনি নিজে মাওলানা মাহমুদ সাহেব রামপুরী রহ.-এর কাছ থেকে শুনেছেন।

জন্য আর দস্তরখানে পড়ে যাওয়া খাবারের পরিত্যক্ত অংশগুলোও এমন জায়গায় ফেলতেন, যেখানে পিঁপড়ের দল আছে।[২৬]

(২১) শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ইযায আলি সাহেব [রহ.] দারুল উলুম দেওবন্দের ওইসব উস্তাদদের একজন ছিলেন, যাদের আশেক আজও লাখের চেয়ে কম নয়।

তার ভয় ও প্রভাব ছাত্রদের মধ্যে এই পরিমাণ ছিল যে, তালেবে ইলমরা তার নাম শুনেই ভয়ে কাঁপত। যদিও মারপিটের কোনোকিছু ছিল না। ওয়ালেদে মুহতারাম হযরত মুফতি শফি সাহেব রহ.-ও তাঁর শাগরেদ ছিলেন।

তিনি বলেন যে, একবার তাঁর সাথে আমরা কয়েকজন সফরে রওনা হলাম। সফরের প্রারম্ভে মাওলানা সাহেব [রহ.] বললেন যে, "কাউকে আমির বানিয়ে নাও।" আমরা বললাম: "আমির তো নির্ধারিত"। মাওলানা সাহেব রহ, বললেন: "আমাকে আমির বানাতে চাইলে তো ঠিক আছে। কিন্তু আমিরের আনুগত্য করতে হবে।" আমরা বললাম: "ইনশাআল্লাহ অবশ্যই।"

তারপর যখন রওনা শুরু হলো, তখণ মাওলানা সাহেব রহ. সাথিদের সামান নিজেই উঠিয়ে নিলেন। আমরা ভয়ে ভয়ে সামান নিতে চাইলে বললেন: "না! আমিরের আনুগত্য জরুরি"। অতঃপর সফরের প্রতিটি স্তরে কষ্টসাধ্য সকল কাজ নিজেই আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আগে আগে যেতেন আর কেউ কিছু বলতে চাইলেই বলতেন: "আমিরের আনুগত্য করো, আমিরের হুকুম মানো।"

(২২) দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা কারি মুহাম্মাদ তাইয়িব সাহেব [রহ.]-এর শ্বশুর মুহতারাম মাওলানা মাহমুদ সাহেব রামপুরি [রহ.] এমন বংশের লোক ছিলেন, যারা দীনের প্রতি দরদ ও মহব্বত এবং

---

২৬ আনওয়ারে আনওয়ারি: ৪০,

দুনিয়াবি বিভিন্ন দিক ও রাজত্বের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর আকাবিরে দেওবন্দের সকলের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল।

তিনি যখন শিক্ষা অর্জনের জন্য দেওবন্দে আসলেন, তখন তার অবস্থান হয় দেওবন্দের ছোট একটি মসজিদের কামরায়। যা 'ছোট মসজিদ' নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। হযরত শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল উলুম থেকে আসা যাওয়ার সময় এদিক দিয়ে অতিক্রম করতেন। একদিন সেখান থেকে অতিক্রম করার সময় দেখলেন যে, সেখানে মাওলানা মাহমুদ সাহেব রামপুরি দাঁড়ানো আছে।

হযরত শায়খুল হিন্দ [রহ.] জানতেন না তার দেওবন্দে আসার অবস্থা। তাই তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কখন এসেছ? কীভাবে এসেছ? তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করে বললেন যে, এই মসজিদের কামরায় অবস্থান করছি। হযরত রহ. ওই কামরার ভেতর তাশরিফ নিয়ে গেলেন এবং তার থাকার জায়গা দেখলেন। সেখানে ঘুমানোর জন্য মাটির মধ্যে শুধুমাত্র একটি বিছানা বিছানো ছিল। ওই সময় তো হযরত রহ. তো সেখান থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু হযরতের মনে এই খেয়াল আসলো যে, মাহমুদ রামপুরি সাহেব তো ধনী ঘরানার লোক। সে হয়ত মাটিতে থেকে অভ্যস্ত নয়, এখানে হয়ত তার কষ্ট পোহাতে হচ্ছে।

সুতরাং হযরত শায়খুল হিন্দ বাড়িতে গিয়ে নিজের মাথায় বহন করে একটি চৌকি নিয়ে ছোট মসজিদের দিকে চললেন। যথেষ্ট দূরত্ব ছিল। কিন্তু হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. ওই অবস্থায়ই গলি এবং বাজার অতিক্রম করে ছোট মসজিদে পৌঁছে গেলেন। ওই সময় মাওলানা সাহেব মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। সেখানে পৌঁছে শায়খুল হিন্দ রহ. এর মনে এই খেয়াল আসলো, যদি আমাকে এই অবস্থায় সে দেখে নেয় তাহলে সে লজ্জিত হবে যে, আমার ভালোর জন্য শায়খুল হিন্দ রহ. চৌকি নিজে বহন করে নিয়ে এসেছেন।

সুতরাং তাকে দেখেই শায়খুল হিন্দ রহ. চৌকি নিচে রেখে দিলেন আর বললেন: "নাও মিয়া। এই চৌকি তুমি নিজে ভেতরে নিয়ে যাও। আমিও তো শেখজাদা। কারো চাকর নই।"[২৭]

তাকওয়া ও খোদাভীতি

(২৩) আল্লাহ তা'আলা আকাবিরে দেওবন্দের তাওকয়া ও আল্লাহর দিকে তাদের অভিমুখী হওয়াকে এমন সাঁচে ঢেলেছেন যে, "سيماهم في وجوههم" এর দৃষ্টান্ত হয়ে গিয়েছেন। মানুষ তাদের চেহারা দেখেই ইসলাম কবুল করে নিতো। মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ারি [রহ.] বলেন যে, মুযাফফরগড়ের সফরের সময় বিস্ময়কর এক ঘটনা সামনে আসে।

মুলতান ছাউনির স্টেশনে ফজরের নামাজের পূর্বে হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী সাহেব রহ. গাড়ির জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন। আশেপাশে খাদেমদের ভিড় ছিল। রেলওয়ের এক হিন্দু বাবু সাহেব ল্যাম্প হাতে নিচ্ছিলেন। হযরত শাহ সাহেব [রহ.] এর আলোকিত চেহারা দেখে সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনবরত কান্না করতে লাগলেন। অতঃপর সেই সাক্ষাৎই তাঁর হেদায়াতের কারণ হয়ে যায়। তিনি বলতেন: "এই বুযুর্গের আলোকিত চেহারা দেখেই আমার বিশ্বাস হয়ে গেল, ইসলাম সত্য ধর্ম।"[২৮]

(২৪) সকল আকাবিরে দেওবন্দ সকলের মধ্যে একটি বিষয় পাওয়া যেত। আর তা হলো, আক্ষরিক জ্ঞানকে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা গুরুত্ব দিতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে ইনাবত ইলাল্লাহ এবং ইসলাহ ও তাকওয়া না হতো।

হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন থানাভবনের খানকায় মাদরাসায়ে এমদাদিয়া প্রতিষ্ঠা করলেন তখন হযরত

---

২৭ আরওয়াহে ছালাছা: ২২৪ নং ৩২৭

২৮ মেরে ওয়ালেদে মাজেদ 'হযরত মুফতি শফি রহ লিখিত: ৫২

মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহি সাহেব-কে তা জানিয়ে চিঠি লিখলেন। হযরত রহ. জবাবি চিঠিতে লিখেন: "ভালো কথা। কিন্তু খুশি তো তখনি হতে পারে যখন এখানে আল্লাহ আল্লাহ জপকারীরা একত্রে জমা হয়ে যাবে।"[২৯]

(২৫) সুতরাং দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি ও বুনিয়াদটাই হলো 'ইনাবাত ইলাল্লাহ'। আমার সম্মানিত দাদা মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসিন সাহেব রহ. বলেন:

"আমরা দারুল উলুমের সেই সময় দেখেছি, যখন সদরে মুদাররিস থেকে নিয়ে সর্বনিম্ন স্তরের মুদাররিস পর্যন্ত এবং মুহতামিম থেকে নিয়ে দারোয়ান এবং পিয়ন পর্যন্ত সকলেই সাহেবে নিসবত বুযুর্গ এবং আল্লাহর অলি ছিলেন। দারুল উলুম ওই সময় দিনের বেলায় দারুল উলুম এবং রাতের বেলায় খানকাহ মনে হতো। অধিকাংশ কামরা থেকে শেষরাতে তেলাওয়াত ও জিকিরের আওয়াজ শোনা যেত। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল দারুল উলুমের অনন্য বৈশিষ্ট্য।"[৩০]

(২৬) দারুল উলুম দেওবন্দের দ্বিতীয় মুহতামিম হযরত মাওলানা রফিউদ্দিন সাহেব [রহ.] যদিও নিয়ম মাফিক আলেম ছিলেন না, কিন্তু তিনি শাহ আবদুল গনি সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলভি রহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা ছিলেন। এবং এই স্তরের বুযুর্গ ছিলেন যে, হযরত নানুতভি [রহ.] একবার বলেন: "মাওলানা রফিউদ্দিন সাহেব রহ. আর মাওলানা গঙ্গুহি রহ.-এর মধ্যকার পার্থক্য এতটুকুই যে, গঙ্গুহি রহ. আলেম আর তিনি আলেম নন। অন্যথায় বাতেনি সম্পর্কের দিক থেকে উভয়ে একই স্তরের ছিলেন।"[৩১]

তাঁর ঘটনা ছিল এই, তিনি একটি গাভি পালন করতেন, যার দেখভাল করার জন্য এক খাদেমের হাতে সোপর্দ করেছিলেন। একদিন ঘটনাক্রমে কোনো একটি কারণে গাভিটি মাদরাসার আঙিনায় বেঁধে রেখে কোনো কাজে সে চলে গেল।

---

২৯ আশরাফুস সাওয়ানিহ: ১/১৩১
৩০ মেরে ওয়ালেদে মাজেদ' : ৬০
৩১ এই ঘটনাটি আমি আমার পিতা মুফতি শফি সাহেব রহ. এর কাছে শুনেছি।

দেওবন্দের বাসিন্দা কোনো এক ব্যক্তি এদিক থেকে অতিক্রম করলে মাওলানা রহ.-এর গাভি মাদরাসার আঙিনায় বাঁধা অবস্থায় দেখলে মাওলানা সাহেবের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে বলল: "মাদরাসার আঙিনা কি আপনার গাভি পালন করার জন্য?"

মাওলানা রহ. কোনো উজর পেশ করার পরিবর্তে সেই গাভিটিই দারুল উলুম দেওবন্দে দান করে দিলেন, আর সেই বিষয়টি সাথে সাথেই সমাধা হয়ে গেল। অথচ মাওলানা সাহেবের উজর প্রকাশ্যই ছিল। কিন্তু তারা এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যারা নিজের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিরোধ গ্রহণই করতেন না।[৩২]

(২৭) হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানি [রহ.] দারুল উলুম দেওবন্দের ওই যুগের মুহতামিম ছিলেন, যখন দারুল উলুমের কাজ অনেক বিস্তার লাভ করেছিল। শত শত ছাড়িয়ে গিয়েছিল তখন দারুল উলুমের তালেবে ইলমের সংখ্যা।

নতুন নতুন অনেক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং সার্বক্ষণিক তদারকি ছাড়া সেগুলো চালানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতি শফি সাহেব [রহ.]-এর কাছ থেকে শুনেছি যে, ওই যুগেও তিনি নামাজ ও তেলাওয়াত ও অন্যান্য নিয়মিত আমল ছাড়াও দৈনিক সোয়া লাখবার ইসমে জাতের আমল কখনো বাদ যেত না। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁর তাওয়াক্কুল ভরসা এই পরিমাণ ছিল যে, একবার দারুল উলুমের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কঠিন এক তুফান ওঠে আর কিছু মানুষ হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব [রহ.]-এর প্রাণের দুশমন পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু এমতাবস্থাতেও তিনি রাতের বেলায় দারুল উলুমের খোলা ছাদের নিচে শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তেন। কোনো কোনো কল্যাণকামী আরজ করলেন যে, এমন অবস্থায়

---

৩২ হায়াতে শায়খুল হিন্দ-মাওলানা সাইয়েদ আসগার হুসাইন: ১৮৯

আপনার জন্য এভাবে শোয়া উচিত নয় বরং সাবধানতা অবলম্বন করে কামরার ভেতর শোয়া উচিত।

মাওলানা রহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাবে বললেন: "আমি তো সেই বাপের বেটা (হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে উদ্দেশ্য করলেন) যার জানাযাকে উঠানোর জন্য চারজন ছিল না আর যাকে রাতের অন্ধকারে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়েছে। সুতরাং আমি কীভাবে মৃত্যুকে পরোয়া করতে পারি।"[৩৩]

তাঁরা হলেন দেওবন্দের ওইসব বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত, শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ব্যস্ত থাকতেন আর ব্যবস্থাপনামূলক কাজের বিশেষত্ব হিসাবে। কখনও কখনও তাদের আপত্তি করা হয়েছিল। আর সাধারণত আল্লাহর অলিদের মধ্যে তাদেরকে গণ্য করা হতো না।

(২৮) শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-এর নিয়মিত আমল ছিল যে, সারাদিন তালিম-তাদরিসের কষ্ট পোহানোর পরেও রাতের দুইটার সময় জাগ্রত হয়ে যেতেন এবং ফজর পর্যন্ত নফল ও জিকির আজকারে মশগুল থাকতেন এবং রমজানুল মুবারকের সমস্ত রাতে জাগার অভ্যাস ছিল। হযরত শায়খুল হিন্দ [রহ.] যেখানে থাকতেন সেখানে সাহরির কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত তারাবিহ চলত এবং বিভিন্ন হাফেজগণ কয়েক পারা করে শোনাত। এমনকি হযরত রহ.-এর পা ফুলে যেত আর 'حتى تورمت قدماه' এর সুন্নাতে নববিয়্যাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নসিব হয়ে যেত।

একবার খোরাক ও নিদ্রার কমতি এবং দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকার প্রভাবে হযরত রহ.-এর দুর্বলতা অনেক বেড়ে যায়। এরপরেও রাতভর তারাবিহর এই আমল পরিত্যাগ করেননি। অবশেষে বাধ্য হয়ে ঘরের নারীরা তারাবির ইমাম মওলভি কিফায়াতুল্লাহ সাহেবের মাধ্যমে বললেন: আজ কোনো বাহানায় সামান্য

---

৩৩ হায়াতে আনওয়ার: ১৫৫-১৫৭

তিলাওয়াত করে নিজের দুর্বলতা ও অলসতার কথা বলে উজর পেশ করবেন। হযরত শায়খুল হিন্দ [রহ.] অন্যের শান্তি ও আরামের প্রতি অনেক বেশি খেয়াল করতেন। তাই তিনি মনজুর করে নিলেন। তারাবিহ শেষ হয়ে গেল আর ভেতরে হাফিজ সাহেব শুয়ে পড়লেন আর বাহিরে শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি। কিন্তু একটু পরই হাফেজ সাহেব অনুভব করলেন যে, কেউ আস্তে আস্তে পা দাবাচ্ছে। তিনি সতর্কতার সাথে দেখলেন যে, শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার পা দাবাচ্ছে।

তা দেখে হাফেজ সাহেবের আশ্চর্যের আর সীমা রইল না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু মাওলানা শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতে লাগলেন: "না ভাই! কী অসুবিধা? তোমার শরীর ভালো নয়। সামান্য আরাম চলে আসবে।"[৩৪]

(২৯) হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-র ঘটনা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তাঁর ইলম ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিস্ময়কর স্মৃতি শক্তি এত বেশি প্রসিদ্ধ ছিল যে, এতে তাঁর অন্যান্য গুণগুলো চাপা পড়ে যায়। অন্যদিকে তাকওয়া ও ইনাবত ইলাল্লাহ এবং সুলুক ও তাসাওফের লাইনেও তিনি উচ্চ স্তরের মর্যাদা অর্জন করেছিলেন।

হযরত মাওলনা মনযুর নুমানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে তিনি নিজে বর্ণনা করেন, একবার আমি কাশ্মির থেকে আসছিলাম। রাস্তায় জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলো, যে ছিল পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ এক পিরের মুরিদ। তিনি আকাঙ্ক্ষা করছিলেন আর আমাকে উৎসাহিত করছিলেন আমি যেন তার পির সাহেবের খেদমতে হাজির হই।

আশ্চর্যজনকভাবে উক্ত পির সাহেবের বাড়ি আমার রাস্তার মধ্যেই পড়ে। তাই আমিও উক্ত পির সাহেবের দরবারে যাবারা এরাদা করে নিলাম। আমরা যখন

---

৩৪ আরওয়াহে ছালাছাহ: ১৫০-১৫১ নং ১৯১

পির সাহেবের কাছে তখন তিনি খুবই সৌজন্যতা করলেন। কিছু কথাবার্তা হলো। অতঃপর মুরিদদের প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাদেরকে তাওয়াজজুহ ঢালতে শুরু করলেন।

যে কারণে মুরিদরা বেহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে তড়পাতে লাগল। আমি সবকিছু দেখতে থাকলাম। অতঃপর আমি বললাম: "আমার মনে চাচ্ছে যে, যদি আমার ওপরেও যদি এ অবস্থা জারি হয়, তাহলে আপনি আমার ওপরেও তাওয়াজজুহ দিন।"

তিনি তাওয়াজ্জুহ দিতে শুরু করলেন আর আমি আল্লাহ পাকের একটি পবিত্রত নামের মোরাকাবা করে বসে গেলাম। বেচারা অনেক জোর দিলেন। কিন্তু কোনো আছর হলো না আমার ওপর। কিছুক্ষণ পরে তিনি নিজে বললেন: "আপনার ওপর আছর করা যাবে না।"

হযরত মাওলানা মনযুর নুমানি [রহ.] বলেন, হযরত শাহ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ঘটনা শুনিয়ে অস্বাভাবিক উত্তেজনা নিয়ে বলতেন:

"কিছুই না। মানুষকে প্রভাবিত করার এক কারিশমা আছে। আল্লাহ প্রাপ্তির সাথে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ যদি চায় আর যোগ্যতা থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ তিনদিনে এই অবস্থা তৈরি হতে পারে যে, কলব থেকে আল্লাহ আল্লাহ আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকবে। কিন্তু এটাও তেমন কিছু নয়। বরং আসল জিনিস তো ইহসানি কাইফিয়ত এবং শরিয়ত ও সুন্নাতের ওপর দৃঢ় অবিচল থাকা।"[৩৫]

---

৩৫ আরওয়াহে ছালাছা: ১৭৪ নং ২২৬

আকাবিরদের দাওয়াত ও তাবলিগের অনুপম পদ্ধতি

(৩০) আল্লাহ তা'আলা আকাবিরে দেওবন্দকে যেমন দীনের তাবলিগ ও দাওয়াতের জজবা দান করেছেন তেমন তাদেরকে 'হিকমত' ও 'মাওয়ায়েজে হাসানা'-কে নিয়ম মাফিক আঞ্জাম দেওয়ার তাওফিকও দান করেছেন। হযরত হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব কান্ধলভি [রহ.]-এর আলোচনা ইতোমধ্যে গত হয়েছে।

একবার সফরের সময় তিনি জালালাবাদ অথবা শামেলি দিয়ে অতিক্রম করেন। সেখানে একটি মসজিদ বিরান পড়ে ছিল। তিনি পানি বের করে অজু করলেন। মসজিদ ঝাড়ু দিলেন। অতঃপর একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন: এই মসজিদে কোনো নামাজি নেই? লোকটি বলল: সামনে খান সাহেবের বাড়ি। সে মদ পান করে এবং পতিতা নারীদের সাথে সময় কাটায়। যদি সে নামাজ পড়তে শুরু করে তাহলে দু'চারজন নামাজি হয়ে যাবে।

মাওলানা মুযাফফর হুসাইন কান্ধলভি [রহ.] ওই খান সাহেবের বাড়িতে গেলেন। সে নেশায় বুদ ছিল আর তার পাশে ছিল বসা ছিল এক খারাপ নারী। মাওলানা রহ. তাকে বললেন: "ভাই খান সাহেব! যদি তুমি নামাজ পড়ো তাহলে দু'চারজন লোক আরও জমা হয়ে যাবে। আর এই মসজিদ আবাদ হয়ে যাবে।" ওই খান সাহেব বলল: আমি তো ঠিক মতো অজু করতেও পারি না। এই দুই বদ অভ্যাসও দুর হয় না। তিনি বললেন: অজু ছাড়াই নামাজ পড়ে নিও, আর শরাব ছাড়তে না পারলে পান করে নিও। ওই লোকটি অঙ্গীকার করে নিল যে, অজু ছাড়াই নামাজ পড়বে। তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু দুরেই নামাজ পড়লেন এবং সেজদার হালতে অনেক কান্নাকাটি করলেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন: "হযরত আপনার পক্ষ থেকে দুটি বিষয় এমন বের হলো, যা কখনো হয় না। এক. আপনি মদ পান ও জিনার অনুমতি দিলেন। দুই. আপনি সেজদায় অনেক কান্নাকাটি করলেন।"

হযরত বললেন: "সেজদার মধ্যে আমি বারি তা'আলার কাছে এই প্রার্থনা করলাম যে, হে রব্বুল ইজ্জত! আমি তো দাঁড় করিয়ে দিলাম। এখন অন্তর তোমার হাতে।"

সুতরাং খান সাহেবের অবস্থা এই হলো যে, যখন পতিতা নারীদের কাছে চলে গেল, তখন জোহরের ওয়াক্ত ছিল। নিজের অঙ্গীকারের কথা মনে পড়ে যায়। তারপর খেয়াল আসে, আজ তো প্রথম দিন, তাই গোসল করে নেই। কাল থেকে অজু ছাড়া আদায় করব। সুতরাং লোকটি গোসল করে পাক-পবিত্র কাপড় পরিধান করে এবং নামাজ আদায় করে নেয়। নামাজের পর বাগানে চলে গেল। আর বাগানে আসর ও মাগরিব ওই অজু দিয়েই আদায় করে নিল। মাগরিবের পরে বাড়িতে পৌঁছে দেখল এক পতিতা রয়েছে। প্রথমে খানা খাওয়ার জন্য ঘরে খাবারের ঘরে গেল। সেখানে নিজ স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়ার পরই স্ত্রীর প্রতি মোহিত হয়ে গেল। বাহিরে এসে ওই পতিতা নারীকে বলল, সামনে থেকে কখনোই আমার বাড়িতে আসবে না।[৩৬]

•••

(৩১) মরহুম আমির শাহ খান সাহেব বর্ণনা করেন, যখন মুনশি মুমতায আলি এর ছাপাখানা মিরাঠে ছিল, তখন তার ছাপাখানায় মাওলানা নানুতভি রহ. ও দায়িত্বরত ছিলেন আর একজন হাফেজজি সাহেবও কর্মচারী করত। ওই হাফেজজি বিলকুল স্বাধীন প্রকৃতির ছিল। প্রশস্ত পায়জামা পরত, দাড়ি বাড়াত, কখনও নামাজ পড়ত না।

কিন্তু হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতভি রহ. এর সাথে গভীর বন্ধুত্ব ছিল তার। সে মাওলানা রহ.-কে গোসল করিয়ে দিতো কোমর ঢলে দিতো। মাওলানা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার চুল আঁচড়ে দিতেন সেও মাওলানা সাহেব রহ.-এর মাথার চুল আঁচড়ে দিতো। যদি মাওলানা সাহেব [রহমাতুল্লাহি আলাইহি]-র কাছে কোনো মিষ্টান্ন ইত্যাদি আসত তাহলে এর থেকে ভাগ অবশ্যই রাখত।

---

৩৬ মেরে ওয়ালেদে মাজেদ: ৫৯

মোটকথা অনেক গভীর সম্পর্ক ছিল। মাওলানা সাহেব রহ.-এর অন্যান্য নেককার বন্ধুরা তার এমন স্বাধীন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব রাখার কারণে নাখোশ ছিল। কিন্তু তিনি এর কোনো পরওয়া করতেন না।

একবার শুক্রবার দিন ছিল। যথারীতি মাওলানা রহমতুল্লাহ আলাইহি হাফেজ্জিকে গোসল করান। গোসল হয়ে গেলে মাওলানা [রহ.] বললেন: "হাফেজ্জি! তুমি আর আমি বন্ধু। আর তোমার আমার রঙ আলাদা হলে ভালো লাগে না, তাই আমি তোমার সুরত অবলম্বন করব। তুমি তোমার জামাকাপড় নিয়ে এসো, আমি একই জামা পরব আর আমার এই দাড়ি আছে তুমি তা উপড়ে ফেলো। এবং আমি তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি যে, আমি এই জামাকাপড় খুলবো না আর দাড়িও ছোটো করব না বাড়াতেই থাকব।"

এ কথা শুনে তার চোখের অশ্রু চলে আসলো। সে বলতে লাগল: "এ কেমনে হতে পারে যে, আপনি আমাকে আপনার কাপড় দিবেন আমি পরিধান করব এবং আপনার দাড়ি রয়েছে তা ফেলে দেবেন? সুতরাং মাওলনা সাহেব তাকে কাপড় পরিধান করালেন এবং তার বিশাল লম্বা দাড়ি কমিয়ে দিলেন। আর সেইদিন ওই লোক পাক্কা নামাজি হয়ে গেল।[৩৭]

(৩২) দারুল উলুম দেওবন্দের দ্বিতীয় মুহতামিম হযরত মাওলানা রফি উদ্দিন সাহেব রহ.-এর আলোচনা ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। একবার তিনি খেয়াল করলেন, দারুল উলুম দেওবন্দের কয়েকজন হযরত উস্তায নির্ধারিত সময়ের পরে আসে।

সুতরাং তিনি প্রসাশনিক কোনো জবাবদিহিতার পরিবর্তে একটি রুটিন বানিয়ে নিলেন। প্রতিদিন দারুল উলুমের ক্লাসের সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথে দারুল উলুমের দরজায় একটি খাটিয়া রেখে বসে যেতেন। আর যখনি কোনো উস্তাদ আসতেন, তখন সালাম, মুসাফাহা ও অভিবাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করতেন। মুখে কিছু বলতেন না যে, দেরি হলো কেন? তাঁর এই বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন কাজের বদৌলতে দারুল উলুমের সকল উস্তাদ সময়ের প্রতি যত্নবান হয়ে যান।

---

৩৭ মাজালিসে হাকিমুল উম্মাত-হযরত মুফতি শফি সাহেব: ৫৮

একজন উস্তাদ তখনও সামান্য দেরিতে আসত। একদিন যখন নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে সেই মুদাররিস প্রবেশ করলেন, তখন সালাম ও ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করার পর তাকে কাছে ডেকে বললেন:

"মাওলানা সাহেব! জানি আপনার ব্যস্ততা অনেক বেশি। ব্যস্ততার কারণে দারুল উলুমে পৌঁছুতে আপনার দেরি হয়ে যায়। মাশাআল্লাহ! আপনার সময় বড় মূল্যবান, আমি এক বেকার মানুষ, খালি পড়ে থাকি। আপনি এক কাজ করুন, আপনার ঘরের কাজগুলো আমাকে বলে দিন, আমি নিজে সেগুলো আঞ্জাম দেবো, যাতে তালিমের জন্য আপনার সময় বের হয়ে যায়।

হযরতের কথা বলার আশ্চর্য এই পদ্ধতি যা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার তা তো বাস্তবায়িত হয়ে যায়। এবং সেই মুদাররিস পরবর্তীতে সবসময় সময়ের প্রতি যত্নবান হয়ে যান।[৩৮]

(৩৩) হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে আল্লাহ তা'আলা এই শতাব্দিতে ইসলাহে খলকের খালেস তাওফিক দান করেছেন এবং তা আদায় করার জন্য অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি দান করেছিলেন।

উর্দু ভাষার প্রসিদ্ধ কবি জনাব মরহুম জিগর মুরাদাবাদি এর একটি ঘটনা রয়েছে। এক মজলিসে হযরত খাজা আযিযুল হাসান মাজযুব রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত থানভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে আলোচনা করেন যে, "জিগর মুরাদাবাদির সাথে একবার আমার সাক্ষাৎ হলে সে বলে, থানাভবন যেতে মনে চায়, সেখানকার জিয়ারত করতে মনে চায়। কিন্তু আমি এই মসিবতে আছি যে, আমি শরাব ছাড়তে পারছি না। কোন মুখ নিয়ে সেখানে যাব?"

হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি খাজা আযিযুল হাসান মাজযুব [রহ.]-কে জিজ্ঞেস করলেন: "তারপর আপনি কী জবাব দিলেন?" খাজা সাহেব বললেন যে, আমি বলে দিয়েছি, "হ্যাঁ! তা তো ঠিকই আছে। এমতাবস্থায় বুযুর্গদের কাছে যাওয়া কীভাবে মুনাসিব হতে পারে?" হযরত থানভি [রহ.] বললেন: "বাহ খাজা

---

৩৮ মাজালিসে হাকিমুল উম্মাত; ৬০-৬২

সাহেব! আমি তো ভেবেছিলাম আপনি তরিকত বুঝে ফেলেছেন। কিন্তু বুঝতে পারলাম আমার ধারণা ভুল।" খাজা সাহেব বিস্ময় হয়ে গেলে থানভি রহ. বললেন: "আপনি বলে দিতেন, যে অবস্থাতেই আছো ওই অবস্থাতেই চলে যাও। হতে পারে এই সাক্ষাৎই এই মসিবত থেকে মুক্তির মাধ্যম হয়ে যাবে।"

সুতরাং খাজা সাহেব রহ. সেখান থেকে ফিরে গেলেন। তারপর ঘটনাচক্রে জিগর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আর সমস্ত ঘটনা জিগর সাহেবকে শুনিয়ে দেন। জিগর সাহেব হযরত থানভি সাহেব রহ.-এর কথাগুলো শোনার পর লাগাতার কাঁদতে শুরু করেন। অবশেষে অঙ্গীকার করে নেন যে, এখন মরে গেলেও এই অপবিত্র জিনিসের কাছে যাবো না।

সুতরাং এমনটাই হয়। মদ পান ছেড়ে দেওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন জিগর মুরাদাবাদি। অবস্থা নাযুক হয়ে যায়। ওই সময় মানুষ বলল যে, প্রয়োজন অনুপাতে পান করার শরিয়ত অনুমতি দিবে। কিন্তু জিগর সাহেবের জিগর (কলিজা) ছিল যে, এতকিছুর পরেও তিনি আর উম্মুল খাবায়েছ মদের বোতলে হাত লাগাননি।

আল্লাহ তা'আলা হিম্মত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞদের সাহায্য করেন। তখনও হক তা'আলার সাহায্যে কয়েকদিনের মধ্যে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। এরপর তিনি থানাভবনে চলে আসেন এবং হযরত থানভি রহ. তাকে অনেক সম্মান করেন।[৩১]

(৩৪) যথাসম্ভব শিমলার কোনো এক কলেজে হযরত থানভি রহ.-এর বয়ান হলো। সেখানে তিনি বলেন যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে যেসব সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়, তাতে কেবল সিলেবাসের দোষ নয় বরং এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, দীনহীন পরিবেশ। যে পরিবেশে আমাদের নতুন প্রজন্ম পালিত হচ্ছে এবং সেই পরিবেশে মিশে যাচ্ছে। এর চিকিৎসা হলো বুযুর্গ ও নেককারদের মজলিস- আলহামদুলিল্লাহ এগুলো আজ প্রায় জায়গায়ই কিছু না কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে- সেখানকার পরিবেশে কিছুদিন অতিবাহিত করার অভ্যাস গড়া।

---

৩১ আরওয়াহে ছালাছা: ১৭৫, নং ২২৮

মনে হয় ওই মজলিসেই এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, আমরা শুনতে পেলাম যে, ইংরেজি পড়াকে আপনি ঘৃণার চোখে দেখেন? হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন: "কখনোই না। কখনোই এমন ব্যক্তিকে ঘৃণা করি না। অবশ্য তাদের কিছু কাজকর্মকে ঘৃণা করি, যা শরিয়তের খেলাফ।"

ওই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: "হযরত! ওই কাজগুলো কী কী?" হযরত থানভি [রহ.] বললেন: "একেক লোকের একেক কাজ কর্ম রয়েছে। সবার মাঝে তো একরকম কাজ পাওয়া যায় না।"

ওই লোকটিও স্বাধীনচেতা লোক ছিল। বলতে লাগল, "উদাহরণত আমার মাঝে কী আছে?" বর্তমানের সাধারণ ও স্টাইলিস্ট ছাত্রদের মতো তার দাড়ি পরিষ্কার ছিল। অর্থাৎ, কোনো দাড়ি ছিল না। হযরত রহ. বললেন: "কিছু বিষয় তো প্রকাশ্য। কিন্তু ভরা মজলিসে তা প্রকাশ করতে লজ্জা তার প্রতিবন্ধকতা। আর আপনার বাকি অবস্থা ও চলাফেরা আমার জানা নেই। যে কারণে কোনো রায় পেশ করতে পারি না।"

ওই জলসার সমাপ্তি হলো। হযরত রহ. থানাভবন ফিরে গেলেন। অতঃপর হঠাৎ কলেজ বন্ধ হলে এক ছাত্রের চিঠি আসলো। চিঠির মধ্যে লিখা ছিল, "এখন আমাদের কলেজ বন্ধের সময়। আমি আপনার বলে দেওয়া পদ্ধতিতে কিছু দিন আপনার খেদমতে থাকতে চাই। কিন্তু আমার বাহ্যিক সুরতও শরিয়তের মোতাবেক না এবং আমল আখলাকেও অনেক গড়বড়। এই অবস্থায় উপস্থিত হওয়ার অনুমতি হলে আমি হাজির হয়ে যাবো।"

হযরত থানভি রহ. লিখলেন: "যে অবস্থায় আছেন, চলে আসুন। চিন্তার কোনো কারণ নাই।" ওই ছাত্র চলে আসলো আর আরজ করল যে, "অনেক সন্দেহ সংশয় এবং অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে সেগুলোর সমাধান চাই।" হযরত থানভি রহ. বললেন: "সম্ভব, তবে এই সুরতে যে কাজ করতে হবে তা হলো আপনার যতগুলো সংশয় রয়েছে সবগুলো লিখে নিন এবং আপনি মজলিসে বসে আমাদের কথাবার্তা শুনুন, কোনো প্রশ্ন করবেন না। আপনার অবস্থানে তিনদিন অবশিষ্ট থাকলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, তখন আমি আপনার জিজ্ঞাসার মধ্যে আলাদা সময় দিবো। আরও বললেন, যেই জিজ্ঞাসাগুলো আপনি লিখে

রাখবেন, ওই সময়টুকুতে কোনো জিজ্ঞাসার জবাব বুঝে আসলে সেটি কেটে দিবেন।

ওই ছাত্রটি এমনই করল আর যখন অবস্থান করার তিনদিন বাকি রইল তখন হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রশ্নের জন্য সময় দিয়েছে তখন তিনি বললেন যে, আমার জিজ্ঞাসার অনেক লম্বা ফিরিস্তি ছিল। কিন্তু অবস্থানের সময়গুলোতে অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব আমার বুঝে আসে। সেগুলো কাটতে থাকলাম। এখন শুধুমাত্র কয়েকটি প্রশ্ন বাকি রইল। সুতরাং ওই প্রশ্নগুলো ছাত্রটি পেশ করতে লাগল। আর হযরত রহ.-এর কাছ থেকে জবাব পেয়ে স্থায়ীভাবে প্রশান্তি লাভ করল।[৪০]

বিরোধীদের সাথে ব্যবহার

(৩৫) আকাবিরে দেওবন্দ-এর অনন্য এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তারা তাদের বিরোধী ঘরানাগুলোর সাথেও অসদাচারণ করতেন না, অসৌজন্যমূলক আচরণ করতেন না, তাদের যুক্তি-দলিল খন্ডন করার সময় হৃদয়বিদারক কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতেন না, কোনো অবমাননাকর ডাকনাম বা উপাধিতে ভূষিত করাকে পছন্দ করতেন না। বরং যথাসম্ভব হতে পারে অসদাচরণের জবাব সুন্দর মেজাজে দিয়েছেন এবং বিরোধীদের দীনি সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতাকে সামনে রাখতেন। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভি রহ.-এর বিশেষ খাদেম হযরত আমির শাহ খান সাহেব বলেন যে, একবার মাওলানা রহ. খুরজা এলাকায় গেলেন। আর সেখানে এক মজলিসে মৌলভি ফজলে রাসুল বাদায়ুনির ব্যাপারে আলোচনা সমালোচনা চলছিল। [যেহেতু তিনি ছিলেন বিরোধী মাসলকের ব্যক্তি, তাই] আমার জবান থেকে [রসিকতা হিসেবে] ফজলে রাসুল এর পরিবর্তে ফসলে রাসুল বের হয়ে গেল।

মাওলানা রহ. বেজার হয়ে গেলেন। আর বললেন: "মানুষ তাকে কী নামে ডাকে?" আমি বললাম: "ফজলে রাসুল বলে ডাকে।" তিনি বললেন: "তুমি ফসলে রাসুল কেন বললে?"

---

৪০ আরওয়াহে ছালাছা: ২১১, নং ৩০৮

হযরত থানভি এই ঘটনা আলোচনা করে মন্তব্য করে লিখেন:

"এরা তো এমন ব্যক্তি ছিলেন, যারা 'لا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب' এর পুরোপুরিভাবে আমলকারী ছিলেন। এমনকি বিরোধীদের ব্যাপারেও তারা এ পন্থা অবলম্বন করতেন।"[৪১]

(৩৬) বেরেলির মৌলভি আহমদ রেজা খান আকাবিরে দেওবন্দের ওপর যে তাকফির করেছে, তাঁদেরকে গালাগালি করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তা তো লেখাপড়া জানা প্রতিটি মানুষ মাত্রই জানে।

ফেরেশতার স্বভাবধারী এমন আকাবিরদের বিরুদ্ধ গালি দেওয়ার ক্ষেত্রে সে কোনো ত্রুটি করেনি। কিন্তু হযরত গঙ্গুহি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-তার গালিগালাজের সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তু। একদিন তার যোগ্য শাগরেদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া সাহেব কান্ধলভি রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বলেন, তার রচনা আমাকে শোনাও। হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব আরজ করলেন যে, "হযরত তার লেখার মধ্যে তো গালি আর গালি।" এ কথা শুনে গঙ্গুহি রহ. বললেন:

"আরে গালির কি হয়েছে? তুমি পড়ে শোনাও। অবশেষে দলিল তো দেখুন। যুক্তিসঙ্গত কোনোকিছু যদি লেখা থাকে তাহলে আমরা রুজু করে নেই।"[৪২]

আল্লাহু আকবার! এ হচ্ছে সত্যপন্থিদের পথ, আল্লাহ ওয়ালাদের পথ ও পন্থা যে, বিরোধীদের কথাই নয় বরং শত্রুদের কথাও অনেক গালিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এই নিয়তে শুনেছেন যে, নিজেদের কোনো ত্রুটি ও ভুল নজরে আসলে তা থেকেও যেন রুজু করা যায়।

(৩৭) মাওলানা মাহমুদ সাহেব রামপুরি [রহ.] (যার আলোচনা পূর্বেও এসেছে) তিনি বলেন যে, একবার আমি এবং এক হিন্দু তহসিলদার দেওবন্দে কোনো কাজে গেল। আমি শায়খুল হিন্দ [রহ.]-এর কাছে মেহমান হিসেবে ছিলাম। ওই

৪১ আরওয়াহে ছালাছা: ২৮৫, নং ৪৩২

৪২ হায়াতে শায়খুল হিন্দ-সাইয়িদ আসগার হুসাইন সাহেব: ১৮৩

হিন্দু লোকটিও তার ভাইয়ের বাড়িতে খানা খেয়ে আমার কাছে এসে বলল: আমিও এখানে থাকব। তাকে একটি চৌকি দেওয়া হলো।

সবাই যখন শুয়ে পড়লো, আমি দেখতে পেলাম মাওলানা শায়খুল হিন্দ [রহমাতুল্লাহি আলাইহি] তাশরিফ এনেছেন। আমি শুয়ে রইলাম। ভাবলাম কোনো কষ্টের কাজ করলে আমি তার সাহায্য করব, নাহয় খামোখা জেগে থাকার প্রকাশ করে কেন পেরেশান করব তাঁকে। দেখতে পেলাম, মাওলানা সাহেব [রহ.] ওই হিন্দুর দিকে বাড়লেন এবং তার চৌকির ওপরে বসে তার পা দাবাতে শুরু করলেন। লোকটি নাক ডেকে অনেক ঘুম দিচ্ছিল।

মাওলানা মাহমুদ সাহেব বলেন যে, আমি উঠে বললাম যে, হযরত! আপনি কষ্ট করবেন না। আমি পা দাবিয়ে দেই। মাওলানা সাহেব রহ. বললেন: তুমি শুয়ে পড়ো। সে আমার মেহমান। আমিই তার খেদমতের আঞ্জাম দেবো। বাধ্য হয়ে চুপ রইলাম, আর মাওলানা রহ. ওই হিন্দু লোকটির পা দাবাতে থাকলেন।[৪০]

(৩৮) কানপুরের মুদাররিস মাওলানা আহমদ হাসান সাহেব পাঞ্জাবি " ابطالِ امکانِ کذب" এর মধ্যে একটি বিস্তারিত রিসালা লিখে প্রকাশ করেছিল। যার মধ্যে হযরত মাওলানা ইসমাইল শহি রহ. এবং তাদের সমমনা আকিদা বিশ্বাস ধারণকারীদেরকে ভ্রান্ত ফিরকা 'মুযদারিয়া' [যারা মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের একটি উপশাখা]-এর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়, আর এর মধ্যে প্রশংসার বাণী লিখেছিল, তারা আকাবিরে দীনের বিরুদ্ধে এমন এমন ভাষা ব্যবহার করেছিল, যা বলার মতো নয়।

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি [রহ.] এ রিসালা দেখে গোস্বা তো অনেক এসেছিল, কিন্তু তার ইলম ও তাকওয়ার উচ্চ মাকাম দেখুন যে, ক্রোধ ও গোস্বার জজবাকে পানি করে দিয়ে বললেন:

"এইসব উদ্ধত লোকদের মন্দ আখ্যা দিয়ে আকাবিরদের প্রতিশোধ পূর্ণ করা যাবে না। আর তাদের বড়দের ব্যাপারে কিছু বলে যদি হৃদয় শীতল করা যায়, তাহলে তারা মা'যুব ও বেকসুর।"

---

৪০ আশরাফুস সাওয়ানিহ: ১/৬৮-৭২

(৩৯) হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. এর মাওয়ায়েজের যে দৃষ্টান্তহীন ফায়দা উম্মতের কাছে পৌঁছেছে, তা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না।

হযরত রহ.-এর মাওয়ায়েজের ফয়েজ আজ অবধি জারি রয়েছে। যারাই তার মাওয়ায়েজগুলো অধ্যয়ন করেছেন, মুতালাআ করেছেন তারাই বুঝতে পেরেছেন যে, থানভি রহ.-এর মাওয়ায়েজগুলো দীনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বিষয়কে ঘিরে হয় এবং ইসলাহ ও তারবিয়তের ক্ষেত্রে তুলনাহীন প্রভাব রাখে।

একবার জৌনপুরে তার একটি ওয়াজ হওয়ার কথা। সেখানে বেরলভি ঘরাণার লোকদের এক বিরাট জন সমাগম ছিল। হযরতের কাছে একটি বেহুদা চিঠি পৌঁছে। যাতে চারটি বিষয় বলা হয়। এক কথা হলো, আপনি তাঁতি, অন্যটি হলো আপনি জাহেল [অজ্ঞ] এবং তৃতীয়টি হলো আপনি কাফের। আর চতুর্থটি হলো সাবধানতার সাথে বয়ান করবেন।

হযরত থানভি রহ. বয়ান করার পূর্বে তিনি জন সমাগমের উদ্দেশ্যে বললেন যে, একটি চিঠি আমার হাতে পৌঁছেছে। তারপর তিনি সেই চিঠিটি সবার সামনে পড়ে শোনানোর পর বললেন, "এখানে যে লেখা 'তুমি তাঁতি'। যদি আমি তাঁতি হই তাহলে কোনো অসুবিধা আছে? আমি তো এখানে কোনো আত্মীয়তা করতে আসিনি। আল্লাহর বিধান শোনানোর জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং জাতীয়তার সাথে এ কী সম্পর্ক? দ্বিতীয় এই জিনিস ইচ্ছাকৃতও নয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে যেই কওম ও গোত্রের মধ্যে চান, সৃষ্টি করেন। জাতি ও গোত্র-বংশ তো আল্লাহ তা'আলারই বানানো। আমল-আখলাক যদি ভালো থাকে তাহলে সবাই ভালো। এটা তো মাসআলার তাহকিক ছিল। রইল বাস্তবতার তাহকিক। মাসআলার তাহকিক হয়ে যাবার পর বাস্তবতার তাহকিক করার কোনো প্রয়োজনই বাকি নেই।

তারপরেও যদি বাস্তবতার অনুসন্ধানের আগ্রহ কারো থাকে তাহলে আমি আমি আমার মাতৃভূমির প্রধান ও নেতৃস্থানীয়দের নাম ও ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। তাদের কাছ থেকে সত্যতা যাচাই করে নিন। জানতে পারবেন, আমি তাঁতি বংশের নাকি অন্য কোনো বংশের?

আর যদি আপনারা আমার কথায় সন্তুষ্ট হোন, তাহলে আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, আমি তাঁতি নই। রইল জাহেল হওয়ার ব্যাপার। অবশ্যই আমি স্বীকার করছি, আমি জাহেল [অজ্ঞ] এমনকি আজহাল [সবচেয়ে অজ্ঞ] ব্যক্তি আমি। কিন্তু যা কিছু আমি আমার বুযুর্গদের কাছ থেকে শুনেছি এবং কিতাবাদির মধ্যে দেখেছি, আমি তা বলে দেই।

কেউ কোনো কথার মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা দেখেন, তাহলে এর ওপর আমল করবেন না। আর কাফের হওয়ার ব্যাপারে যা লেখা আছে, সে ব্যাপারে বেশি কথাবার্তার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাদের সামনেই রয়েছি, এক্ষুণি পড়ছি: "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ।"

নাউজুবিল্লাহ যদি আমি কাফির থাকতাম, তাহলে এই দেখুন এখন আর নই। অবশেষে সতর্কতার সাথে বয়ান করার ধমকি দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে বলছি যে, ওয়াজ করা আমার কোনো পেশা নয়। যখনই কেউ অনেক বেশি জোরাজুরি করে তখন যা কিছু আমি বলতে পারি বয়ান করে দেই। যদি আপনারা না চান, তাহলে আমি কখনোই বয়ান করব না।

সাফ সাফ বলে দিচ্ছি যে, পরিবেশ গরম করা, মানুষকে উত্তেজিত করা আমার অভ্যাস নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো এমন বিষয় বয়ান করি না, যে বয়ানে কোনো দলের লোকের অন্তরে আঘাত হানে অথবা ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি। তবে, শরিয়তের মৌলিক বিষয়ের তাহকিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এমন কোনো মাসআলা আলোচনা যদি জরুরি হয়ে যায়, যা বিদআতি রুসম রেওয়াজের সাথে সম্পৃক্ত, তাহলে আমি তা বয়ান করতে পিছপা হই না। কারণ, তা দীনের মধ্যে সুস্পষ্ট খেয়ানত।

সব কথাবার্তা শোনার পর এখন বয়ান করার ব্যাপারে আপনাদের যে রায়, তা আমাকে জানিয়ে দেওয়া হোক। যদি এখন কোনো কথা কারো চাহিদার বিরুদ্ধে বয়ান করতে শুরু করি, তাহলে সাথেসাথে আমাকে বাধা প্রদান করবেন।

আমি ওয়াদা করছি, নিম্ন থেকে নিম্ন স্তরের কোনো ব্যক্তি যদি আমাকে থামিয়ে দেয়, সাথে সাথে আমি বয়ান বন্ধ করে দিয়ে বসে যাব। সবচেয়ে ভালো হয়, ওই সকল লোকেরা যেন একাজটি করেন, যারা চিঠিটি প্রেরণ করেছেন। যদি নিজেরা

বলতে লজ্জা পান অথবা সাহস না হয়, তাহলে গোপনে অন্য কাউকে শিখিয়ে দেবে। তাদের পক্ষ থেকে সে এসে আমাকে বাধা দেবে।

এ কথা শুনে এক যুক্তিবাদি মৌলভি-যে নিজেও ছিল বিদআতপ্রবণ একজন ব্যক্তি এবং যথেষ্ট প্রভাব ছিল তার সেখানে-চিৎকার করে বলে উঠল: "এ চিঠি যে লিখেছে, সে কোনো হারামজাদা। আপনি ওয়াজ করুন। আপনি কেমন ফারুকি? [স্পষ্টভাষী]"

হযরত থানভি রহ. বললেন: "আমি এমন জায়গার ফারুকি, যেখানকার ফারুকিদেরকে এখানকার মানুষ তাঁতি মনে করে।"

মাহফিলের সকল মানুষ যখন চিঠি প্রেরণকারীদেরকে ভালো-মন্দ বলতে লাগল, বিশেষ করে সেই মৌলভি সাহেব অশ্লীল ভাষায় বকাবকি শুরু করেছিল, তখন হযরত ওয়ালা রহ. তাদেরকে বাধা প্রদান করে বললেন: "গালি দিবেন না। মসজিদের সম্মান তো বজায় রাখবেন।" তারপর হযরত রহ. ওয়াজ শুরু করলেন এবং খুবই জোরালো ওয়াজ হলো।

ঘটনাক্রমে ওয়াজ করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ইলমি তাহকিকের বেলায় কিছু রুসুম ও বিদআতের আলোচনাও চলে আসে। তখন হযরত ওয়ালা রহ. কোনো নিন্দুকের পরোয়া না করে দ্বিধাহীনভাবে সেগুলোর খন্ডন করলেন। তিনিও তো মানুষকে এই এখতিয়ার দিয়ে রেখেছিলেন যে, তারা চাইলেই ওয়াজ বন্ধ করে দিতে পারবে। কিন্তু কারও সাহস হলো না।

ওই যুক্তিবাদী মৌলভি সাহেব; যে শুরুতে অনেক সুন্দরভাবে কথা বলেছিল আর বারবার সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলে আওয়াজ উঁচু করছিল-কারণ তখন তাসাউফের ব্যাপারে বয়ান হচ্ছিল, কিন্তু যখনি বিদআতের খন্ডন শুরু হয়ে গেল তখন চুপ হয়ে গেল, এবং বসে শুনতে থাকল। এটিও ছিল আল্লাহর বড় অনুগ্রহ। কারণ পরবর্তীতে জানা যায়, এলোকটি এমন কট্টর প্রকৃতির ছিল যে, কোনো ওয়ায়েজ ও বক্তা যদি তার স্বভাব বিরুদ্ধ কথা বলে দেয়, তাহলে সে তার হাত ধরে মিম্বার থেকে নামিয়ে দেয়। কিন্তু থানভি রহ. এর বয়ানের সময় চুপ করে বসে বয়ান শুনতে থাকে।

তবে যখন বয়ান শেষ হয়ে যায় এবং সমাবেশ সমাপ্তির জন্য দাড়িয়ে যান তখন উক্ত মৌলভি সাহবে হযরত থানভি রহ.-কে বলল: "এসব মাসআলা বয়ান করার কী জরুরত ছিল?" এ কথা শুনে অন্য আরেক প্রভাবশালী মৌলভি সাহেব [সেও ছিল বিদআতি ধ্যান-ধারণার লোক] সামনে অগ্রসর হয়ে জবাব দিতে চাইল। কিন্তু হযরত থানভি রহ. তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন: "তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আপনি জবাব দিবেন না। আমাকে বলতে দিন।" অতঃপর হযরত থানভি রহ. উক্ত যুক্তিবাদী মৌলভি সাহেবকে বললেন, "আপনি এ কথা পূর্বে আমাকে বলেননি। অন্যথায় আমি সাবধানতা অবলম্বন করতাম। আমি যা কিছু বয়ান করেছি, তা প্রয়োজন মনে করেই করেছি। কিন্তু এখন কী হতে পারে? এখন বয়ান তো হয়ে গেছে। হ্যাঁ একটি সুরত এখনও আছে। আর তা এই যে, এখনও সমাগম বাকি আছে। আপনি আওয়াজ দিয়ে বলে দিন, লোক সকল! এই বয়ানের কোনো প্রয়োজন ছিল। তারপর আমি আপনার কথার বরখেলাফ করব না এবং আপনার কথা-ই হবে শেষ কথা" এ কথা শুনে সবাই হেসে দিলো এবং মৌলভি সাহেব সেখান থেকে চলে গেল।

তার চলে যাবার পর সবাই তাকে ভালমন্দ বলতে শুরু করল। যখন শোরগোল অনেক বেড়ে গেল, তখন হযরত ওয়ালা সাহেব রহ. দাঁড়িয়ে বললেন, "সাথিগণ! এক পরদেশীর কারণে আপনার স্থানীয় উলামাদের কখনোই পরিত্যাগ করবেন না। আমি আজ 'মাছলি শহর' যাচ্ছি। এখন আপনারা এক কাজ করুন, আর আমি বিশেষ করে সেসব ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলছি, যারা আমাকে চিঠি পাঠিয়েছেন; তারা যেন আমার বয়ান খন্ডন করেন। তারপর উভয় মত ও পথ সবার সামনে থাকবে, যে যা চায় অবলম্বন করবে। ফিতনা ফাসাদের কোনো প্রয়োজন নেই।"

তারপর ওই আরেকজন মৌলবি সাহেব [যে নিজে বিদআতি হওয়ার পরেও থানভি রহ. এর সমর্থনে অগ্রসর হয়েছিল] দাঁড়িয়ে বলতে লাগল: "সম্মানিত সাথিরা! আপনারা জানেন, আমি মওলুদিয়া এবং কিয়ামিয়্যাহও। কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ও সত্য কথা হলো, যেই তাহকিক আজ মৌলভি সাহেব বয়ান করেছেন, তাই সঠিক।"[৪৪]

---

৪৪ আশরাফুস সাওয়ানিহ

(৪০) আমি আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতি শফি সাহেব রহ.-এর কাছ থেকে শুনেছি, হযরত শায়খুল হিন্দ রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সম্পৃক্ত লোকদের মধ্যে কেউ বিদআতিদের খন্ডনে এক রিসালা লিখে। বিদআতিরা এর যে জবাব লিখে, তার মধ্যে খন্ডনকারীকে কাফের সাব্যস্ত করে। এই কাজের জবাবে তিনি দুটি কবিতা বলে দিলেন:

مرا کافر اگر گفتی غمے نیست چراغ کذب را نبود فروغے

তুমি বললে আমি কাফের, দুঃখ নেই, তুমি হবে না মিথ্যা প্রদীপ

مسلمانت بخوانم در جوابش دروغے را جزا باشد دروغے

আমি যদি তোমাকে মুসলমান বলি, উত্তর হবে মিথ্যা, মিথ্যাই হোক।

তারা হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-কে কবিতা শুনালে তিনি কাব্যশৈলীর প্রশংসা করলেন। কিন্তু সাথে সাথে বলে দিলেন যে, “তোমরা তাদেরকে সুক্ষ্মতার সাথেই হোক, কাফের তো বলেই দিয়েছ। অবশ্য ফতোয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা কাফের নয়। তাই এই কবিতাগুলোর মধ্যে এভাবে পরিবর্তন করে নাও:

مرا کافر اگر گفتی غمے نیست چراغ کذب را نبود فروغے

তুমি বললে আমি কাফের, দুঃখ নেই, তুমি হবে না মিথ্যা প্রদীপ

مسلمانت بخوانم در جوابش دروغے را جزا باشد دروغے

আমি যদি তোমাকে মুসলমান বলি, উত্তর হবে মিথ্যা, মিথ্যাই হোক।

اگر تو مومنی فبہا، وإلا دروغے را جزا باشد دروغے

তুমি যদি মুমিন হও, তাহলে মিথ্যা বলার জন্য মিথ্যার শাস্তি হোক।

এগুলো এমন কিছু ঘটনা, যা কোনো বিশেষ আয়োজন ও মুতালাআ ছাড়াই কলমের নিচে চলে এসেছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে এই ধরনের ঘটনাবলি সাজানো উদ্দেশ্য নয়।

আল্লাহ কোনো বান্দা যদি আরও গবেষণা ও মুতালাআর পর এইসব মহান ব্যক্তিদের ঘটনা একত্রিত করেন, তাহলে তা হবে ইলম ও দীনের এক বিরাট খেদমত। কিন্তু উপরে আলোচিত ঘটনা আকাবিরে দেওবন্দের সৌন্দর্য দেখানোর জন্যই একত্রিত করেছি। আশা করছি, তা যথেষ্ট হবে।

আকাবিরে দেওবন্দের রাসুলের প্রতি ভালবাসা

আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ [রহ.]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রাণের স্পন্দন। প্রিয় রাসুল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এর প্রতি ভালোবাসা রাখা আমাদের ইমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। রাসুলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ব্যতীত ইমানদার হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর প্রতি প্রেম ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের মাঝে রয়েছে মহান রবের পরিচয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চাইলে, খাঁটি মুমিন হতে চাইলে অবশ্যই অবশ্যই প্রিয় রাসুলের প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা মহব্বত রাখতে হবে।

আকাবিরে দেওবন্দের মাঝে নবিপ্রেম ও সুন্নতে রাসুলের অনুসরণ ছিল দেখার মতো। যেভাবে তারা হাদিসে রাসুলের ইশাআত ও প্রচার প্রসারে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন অনুরূপ রাসুলের সুন্নাহ স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন এবং রাসুলের প্রতি ভালোবাসার অনুপম দৃষ্টান্ত দেখিয়িছেন।

আকাবিরে দেওবন্দ আঠারশ শতাব্দী, উনবিংশ শতাব্দী এবং এই একাবিংশ শতাব্দীর মধ্যমণি। তাঁদের খ্যাতি জগৎজোড়া। বিশ্বপরিমন্ডলে তাঁরা দ্যুতি ছড়িয়েছেন সব জায়গাতে। বিশেষ করে আঠারশ শতাব্দী থেকে নিয়ে এপর্যন্ত উলামায়ে দেওবন্দের যে খ্যাতি, তাঁদের যে ঐতিহ্য-অবদান দেখা যায়, সেটা কল্পনাতীত। বিশ্ব জগতে এরকম এক সুলাহায়ে উম্মত কম দেখা যায়। এর সিলসিলা এবং ধারাবাহিকতা ইস্পাত-পাথরের ন্যায় মজবুত। তাদের সুত্র পরম্পরা পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত। আবার এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। তবে দেওবন্দী আলেমদের কেন এত সৌরভ-সুঘ্রাণ? কেন তাদের এত খ্যাতি? কেন বিশ্বব্যাপি তাঁদের প্রসিদ্ধি? কেনই বা সর্ব লাইনে সেরা? শত শত বছরধরে কীভাবে তাঁরা ঐতিহ্য ধরে আছে। কিসের কারণে তাঁরা পৃথিবী জুড়ে মানুষের কাছে সম্মানিত।

শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) এর রাসুল প্রেম, প্রিয় হাবিব [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর প্রতি কত ভালবাসা ছিল, সেটা তো এখন ইতিহাস। হযরত মাদানী দারুল উলুম থেকে ফারেগ হওয়ার পর প্রেমের টানে নবির দেশে হিজরত করেন। তাঁর পরিবারের সকল সদস্য সেই হিজরতে

ছিলেন। মক্কা মোকাররমাতে হজব্রত পালন শেষে মদিনার দিকে রওনা হন। মদিনায় সফরকালে শুরু হয় আশেক-মাশুকের প্রীতি। পেয়ারা হাবীবের সাথে কত নিগুঢ় ভালবাসা ছিল সেটা প্রমাণ হতে থাকে। তৎকালীন সময় ছিল উটের পিঠের সফর। মদিনা যেতে দীর্ঘ সময় লাগত। ঘাটে ঘাটে বিশ্রাম নিতে হতো। সেই বিশ্রামকালীন সময়ে স্বপ্নযোগে বারবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত হতে থাকে।

সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল। মদিনায় পৌছানোর পরে রওজার সাথে এমন প্রেম ভালবাসা তৈরী হয়, যা নজীরবিহীন। হযরত মাদানী রহ. রওজায় যখন সালাম পেশ করেছেন, সাথে সাথে রওজার থেকে উত্তর চলে আসে 'ওয়ালাইকুমুস্সালাম ইয়া ওয়ালাদী'। আশেপাশে উপস্থিত সকলেই সেটা শ্রবণ করেছিল। এক হৃদয় ছোঁয়া ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনাবলি কমই ঘটেছে। উলামায়ে দেওবন্দের নবিপ্রেম, আল্লাহর হাবিবের প্রতি নিখাদ ভালবাসার কোন দৃষ্টান্ত হয় না।

হযরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ.-এর একটি মালফুয শুনুন: হাফেজ মুহাম্মাদ আজিম সাহেব পেশাওয়ারের একজন আলেম ছিলেন এবং সাহেবে নিসবতও ছিলেন। তিনি অন্ধ ছিলেন আর ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধ হয়েছিলেন। স্বপ্নে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জিয়ারত নসিব হয়। তখন তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরজি পেশ করেন। তার একটি হলো, আপনাকে দেখার পর কাউকে দেখবো না। আর আরেকটি হলো, আপনাকে সবসময় দেখতে থাকব। সুতরাং তিনি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় অন্ধ হয়ে জাগ্রত হন, কিন্তু রাসুলের জিয়ারতে ধন্য হয়ে ছিলেন। [মালফুযাতে হুসনুল আযিয: ১৩২]

মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ রহ. ভাওয়ালপুরের উচ্চ পর্যায়ের আলেম ছিলেন। [হারাম শরিফের মুদাররিস মাওলানা মুহাম্মাদ মাক্কি তাঁর একমাত্র সাহেবযাদা] যিনি ইলমে হাদিসের ক্ষেত্রে হযরত খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ.-এর শাগরেদ ছিলেন। জীবনের অনেকটা সময় তিনি দিয়ারে হাবিব [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]-এর মধ্যে কাটিয়েছেন। হারাম শরিফে হাদিসের দরস দিতেন। তিনি বলেন: হযরত খলিল আহমাদ সাহারানপুরি [রহ.] জীবনে

অনেকবার হজ করেছেন। একবার হজের সময় তিনি কয়েকটি দুআ করেন। তন্মধ্যে একটি দুআ ছিল যে, জীবনের শেষ দিনগুলো মদিনা মুনাওয়ারায় অতিবাহিত করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এই দরখাস্ত কবুল করেন। এ কথা বলার পর মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ সাহেব বলেন, হযরত যখন শেষ বছর মদিনা মুনাওয়ারায় মুকিম ছিলেন তখন আমি একবার আদবের সাথে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হযরত হয়ত এটা একটা আবেগের বিষয় ছিল যে আপনি সফরের কষ্ট সহ্য করে ভারত থেকে হজ্জে আসতেন বা এখন অবস্থা এমন যে আপনি এখানে বসে আছেন, অথচ হজের দিনগুলোতে আপনি মক্কায় যাননি।'
তিনি বললেন: 'খায়র মুহাম্মাদ! ইলমি কোনো বিষয় নয়। অন্তরের কথা বলছি। এখন আমার জীবনের একই তামান্না বাকি রয়েছে যে, খলিল আহমদের দুর্বল হাড্ডি দাফন হওয়ার জন্য যেন মদিনা শরিফের মাটি নসিব হয়। এ কারণেই হজ্জ করতে যাচ্ছি না। যেন এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাই।

কবিতা:

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے
یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے

হযরতের অন্তরের তামান্না পূর্ণ হয়। মদিনা মুনাওয়ারায় তাঁর ওফাত পান এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া [রহ.]; যিনি হযরত সাহারানপুরি [রহ.]-এর খলিফা ও বিশেষ ছাত্রও ছিলেন, তিনিও হযরতেরই পাশে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

সহিহ বুখারির ওপর হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর হস্তলিখিত তাকরীর-ফয়জুল বারী নামে ছাপা রয়েছে। এই তাকরীরগুলোর জমাকারী ও সংকলক শায়খুল হাদিস মাওলানা বদরে আলম মিরাঠীও ছিলেন। পাশাপাশি তাঁর পক্ষ থেকে আলবাদরুস সারী নামে হাশিয়াও রয়েছে। যখন 'باب حرم المدینۃ' এর মধ্যে হযরত উমর রাদিঃ -এর প্রসিদ্ধ দুআ 'اللهم ارزقنى شهادة

'في سبيلك واجعل موتي ببلد رسولك' পর্যন্ত পৌঁছেন তখন বদরে আলম মিরাঠি রহ. হাশিয়ার মধ্যে খুবই প্রিয় একটি দুআ করেন। যার আসল মজা তো আরবি শব্দগুলো পড়লে আসতে পারে। এখানে তার তরজমা করে দিচ্ছি। তিনি বলেন:

"হে আল্লাহ! এটি একটি দুআ; যা তোমার মাহবুব নবি উম্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি করেছেন আর কবুল হয়েছে। আমিও তোমার কাছে এই আবেদনই করছি। তুমি তা কবুল করে নাও। আমাকে বঞ্চিত করো না। হে আল্লাহ! তোমার প্রতি মহব্বতকে আমার অন্তরে সবচেয়ে বেশি প্রিয় করে দাও। তোমার রাসুলের শহরকে আমার কাছে অন্য সব শহরের চেয়ে নিকটবর্তী করে দাও। আমার মৃত্যু সেখানেই নসিব করো। কারণ এই শহর তোমার রাসুলের প্রিয় ছিল। তোমার মাহবুবের কারণে তোমার কাছেও তা প্রিয়। যেহেতু তোমার মাহবুবের কাছে প্রিয় এবং তোমার কাছেও, তাই আমিও এই শহরকে মহব্বত করি। সুতরাং তুমি আমাকে সেখানেই মৃত্যু দাও। আমি আশাবাদী হয়ে তোমার দরবারে এই প্রার্থনা করছি। আমাকে বঞ্চিত করো না। হে আল্লাহ! এ এক আকাঙ্ক্ষাকারীর প্রার্থনা, তুমি তা কবুল করে নাও। তুমি তা কবুল করতে পারো এবং মুশকিলকে আসান করে দেওয়া তোমার জন্য আসান। তোমার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সন্তানাদির উসিলায় আমার দুআ কবুল করে নাও। তুমি সবকিছুর মূল হর্তাকর্তা। আমিন আমিন। [ফয়জুল বারী: ৩/১৪৪]

সুবহানাল্লাহ! কী সুন্দর ও মহৎ দুআ ও প্রার্থনা। প্রিয় পাঠক! আপনারা হয়ত জেনে থাকবেন যে, মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী রহ. জীবনের শেষ বছর মদিনার হারামে অতিবাহিত করেন। ১৩৮৫ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। আর জান্নাতুল বাকীতে উম্মাহাতুল মুমিনীনের কদমতলে সমাহিত হন।

آخر گل اپنی ہوئی صرف در میکدہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا

তাদের ভাগ্য দেখুন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জিয়ারতের সৌভাগ্য নসিব হয়।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভি রহ. হজের সময় মদিনা মুনাওয়ারা তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। নিরেট ভালোবাসার নমুনা দেখুন যে, প্রথমে তো তিনি কয়েক

মনজিল দূরত্বে অবস্থান করছিলেন, তবুও উট থেকে নেমে পায়দল চলতে লাগলেন। অতঃপর পবিত্র রওজা শরিফ দৃশ্যমান হতে লাগল তখন পায়ের জুতাও খুলে নিয়ে বগলদাবা করে তীক্ষ্ম পাথরে ভরপুর রাস্তা দিয়ে উলঙ্গ পায়ে চললেন। [সাওয়ানেহে কাসেমি: ৩/৩১]

হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. বলেন: "মদিনায় সফরের খরচ হিসাব করা উচিত নয়, কারণ তা তো প্রেমের সফর এবং হিসাব করার প্রেম-ভালোবাসার দাবির পরিপন্থী।" [মালফুযাতে হুসনুল আযীয]

এটা কি সেই দল যার উপর একটি গোষ্ঠী বে-আদবির অভিযোগ তোলে? এই অজ্ঞ লোকেরা হয়তো জানে না যে, দুই জাহানের মালিকের দরবার তো ছিল অনেক দূরের বিষয়, এখানে তো তাঁর সমসাময়িক মুরুব্বিদের সম্মান ও ভদ্রতার কাহিনী যারা তাদের পড়ে এবং শোনে তাদেরকেও বিস্মিত করে।

রেখে যাওয়া জিনিসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

সিরাতের কিতাবগুলো সাহাবায়ে কেরামের প্রেম-ভালোবাসার গল্পে ভরপুর। হজরত (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত কিছু হাতে এলে তাঁরা তা নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় মনে করতেন।

আকাবিরে দেওবন্দও নবিজির রেখে যাওয়া জিনিসের প্রতি সীমাহীন সম্মান প্রদর্শন করতেন। হযরত গঙ্গুহি রহ.-এর কাছে মদিনা মুনাওয়ারার যে খেজুর আসত তিনি সেগুলো খাওয়ার পর বিচীগুলো ফেলে দিতেন না। বরং সেগুলো রেখে দিতেন এবং পরবর্তীতে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতেন। [তাযকিরাতুর রশিদ]

হিন্দুস্তানের জালালাবাদে একটি জুব্বা পাওয়া যায়, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে সম্পর্কিত ছিল। বন্টন করার পর এই জুব্বা পাকিস্তানে এসেছিল। কিছুদিন ভাওয়ালপুরেও ছিল। জুব্বা শরিফের মুতাওয়াল্লিরা কখনো কখনো থানাভবন নিয়ে যেতেন। হযরত থানভি রহ. রাতভর তা নিজের কাছে রাখতেন। বলতেন, যে কামরায় এই জুবা রাখা হয় সেই কামরার দিকে পা বিস্তৃত করা ভারী মনে হয়। [মালফুজাত]

হযরত থানভি রহ. বলেন: কা'বা শরিফের দিকে পা বিস্তৃত করা তো বে-আদবি। আমি এত সতর্ক থাকি যে আমার হাঁটার লাঠির নীচের প্রান্তটি কখনই কাবার দিকে না যায়। আশ্চর্য! আল্লাহর শাআইর ও ধর্মীয় নিদর্শনগুলোর প্রতি কতটা শ্রদ্ধা তাদের।

আশ্চর্য লাগে যে, মানুষ আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের সাথে এতো মহব্বত রাখে, একদল নাদান ও মূর্খ লোক তাদেরকে আল্লাহর অলি হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করে।

হাদিস ও সিরাতের গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহের ঘাম অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাস খাদেম হযরত আনাস রাদিঃ-এর সম্মানিতা মাতা উম্মে সুলাইম রাদিঃ বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাঁর ঘরে তাশরিফ আনলেন এবং আরাম গ্রহণ করলেন। তখন হযরতের শরীর মুবারকের ঘাম শিশিতে জমা করে নেন এবং বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সময় তা থেকে ফায়দা নেওয়া হতো।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভি রহ. গোলাপ ফুল অনেক পছন্দ করতেন। একবার হযরত গঙ্গুহি রহ. মজলিসে উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা কী জানো, মাওলানা সাহেব গোলাপ কেন বেশি পছন্দ করেন? এক ব্যক্তি আরজ করল: এক দুর্বল হাদিসে এসেছে যে গোলাপ রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র ঘাম থেকে হয়েছে। বললেন: যদিও দুর্বল হাদিস, কিন্তু হাদিস তো। [আরওয়াহে ছালাছা: ৩০৫]

প্রিয় পাঠক! অবস্থা ও মহব্বতের এসব বিষয়কে আলোচনা সমালোচনার মানদন্ড দিয়ে বিচার করবেন না। হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত বিষয়ের দিকে তাকান এবং এর প্রভাব ও ফলাফল এভাবে আকারে প্রকাশ পায়:

یہ کیفیت اسے ملتی ہے جس کے مقدر میں

مئے الفت نہ خم میں ہے، نہ شیشے میں، نہ ساغر میں

বুযুর্গ ব্যক্তিদের দেওয়া বস্তুকে বরকতের মাধ্যম মনে করা হয়, আমরা তো দেখি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আকাবিরগণ নিজেদের চেয়ে ছোট ব্যক্তিদেরকেও অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের দেওয়া জিনিসকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিছু ঘটনা প্রদত্ত হলো:

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাঁর প্রিয় সাহাবিদেরকে বলেন: সারা দুনিয়ার দিগ্বিদিক থেকে মানুষেরা তোমাদের কাছে দীন শিখতে আসবে। তাদের সাথে আমি তোমাদেরকে মঙ্গল কামনা করার অসিয়ত করে যাচ্ছি।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনের চেয়ে বেশি নববি ফরমানের ধারক বাহক আর কারা হতে পারে?

হযরত আবু সাইদ রাদিঃ বড় একজন সাহাবি ছিলেন। তিনি সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। দামেশকের মসজিদে বসে তিনি মানুষকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস শোনাতেন। যেসব মানুষ হাদিসের দরস গ্রহণ করার জন্য আসত তাদের খেদমতে তিনি সম্মানপ্রদর্শন পূর্বক দাঁড়িয়ে যেতেন।

উলামায়ে দেওবন্দের সাইয়্যিদুত তায়েফা হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. স্বীয় খলিফাদের মধ্য থেকে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভি এবং হযরত মাওলানা গঙ্গুহি রহ.-কে অনেক বেশি সম্মান করতেন।

একবার হযরত মাওলানা গঙ্গুহি রহ. একটি পাগড়ি হযরত হাজী সাহেবের খেদমতে পাঠালেন। আর হাজী সাহেব তা তাবাররুক মনে করে মাথায় রেখে দিলেন। [মালফুযাতে হুসনুল আজিজ, কাসাসুল আকাবির: ৯২]

ইত্তেবায়ে সুন্নাত

প্রিয় নবির সুন্নাহ অনুসরণই দ্বীনের মূলনীতি। এটিই তাকওয়া ও দীনদারীর কেন্দ্রবিন্দু। সুন্নাতের পথ থেকে সরে গিয়ে মানুষ হয়ত পাপ ও পঙ্কিলতায় ডুবে যায় অথবা বিদআত ও কুসংস্কারে লিপ্ত হয়। আর প্রকাশ থাকে যে, উভয় পথই ভুল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাজ দুই প্রকার। যেসব কাজ নবিজি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করতেন সেগুলোকে সুনানে ইবাদাত নামে ডাকা হয় আর যেসব কাজ স্বাভাবিকভাবেই করতেন অর্থাৎ, শরিয়ত মোতাবেক তা করা কোনো সাওয়াবের নয় এবং ছেড়ে দেয়াতেও কোনো গুনাহ নাই সেগুলোকে সুনানে আদাত বলা হয়।

আল্লাহর অলিরা রাসুলের সুন্নাতের এই পরিমাণ খেয়াল করতেন যে, ইবাদত ব্যতীত সাধারণ আদত পর্যন্ত রাসুলের নকল করতে চেষ্টা করতেন এবং এব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের অগণিত ঘটনা মজুদ রয়েছে। আইম্মায়ে দীন ও উলামায়ে সালাফেরও অসংখ্য ঘটনা কিতাবাদির মধ্যে পাওয়া যায়। আকাবিরে দেওবন্দের মধ্যে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর ঘটনা রয়েছে। হযরত থানভি রহ.-এর খলিফা হযরত মাওলানা ওয়াহেদ বখশ আহমদপুরি বলেন: শায়খুল হিন্দ রহ. যখন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন তখন চিকিৎসা চলছিল। যখন ওষুধ পান করার সময় এল তখন তিনি খাদেমদের বললেন যে, আমাকে পালঙ্ক থেকে নিচে নামাও।

এভাবে খাদেমদের জন্য তা নিচে রাখা কোনো কঠিন কাজ তো ছিল না। কিন্তু হযরতের কষ্টের প্রতি তাদের খেয়াল ছিল। অবশেষে হযরতের খেদমতে আরজ করা হলো, হযরত ওষুধ পান করার সময় নিচে নামার কষ্ট জন্য তো আপনার কষ্ট হয়। চারপায়ায় বসেই তো পান করে নিতে পারেন।

তিনি বললেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি চারপায়ায় বসেই ওষুধ সেবন করতেন। এ কারণে আমি নিচে নেমে ওষুধ সেবন করি।

এসব ঘটনা থেকে সম্মানিত পাঠক, একটু অনুমান করতে পারবেন যে, উলামায়ে দেওবন্দ কীভাবে নিজেদেরকে আল্লাহর রঙে রাঙিয়ে নিয়েছেন এবং সুন্নাতে রসুলকে পোশাক বানিয়ে পরিধান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদাকে বুলন্দ করুন।

اعلى الله درجاتهم وجعلنا من اتباعهم.

و صلى الله تعالىٰ على حبيبه وعلى اله وسلم

উলামায়ে দেওবন্দের বিনম্রতার সামান্য ঝলক

মুফতি মুহাম্মদ রশিদ ডাসকভি

যে গুণের কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে ইজ্জত ও মর্যাদা পাওয়া যায় তা হলো আবদিয়তের গুণ। বিনম্রতার বৈশিষ্ট্য। আর যে গুণের কারণে আল্লাহর দরবারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয় তা হলো তাকাব্বুর তথা অহঙ্কার। এই স্বভাবের কারণেই ইবলিস অভিশপ্ত হয়েছে, আসমানি দরবার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে চিরতরে আল্লাহর অভিশাপ ও লানতের যোগ্য হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক আমাদের রক্ষা করুন।

নিজেকে যদি ইখলাস, নিষ্ঠা, বিনম্রতা এবং আবদিয়্যাতের সুন্দর গুণাবলি দ্বারা সুসজ্জিত করে নেওয়া যায় তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য 'ইতাআতে খোদাওয়ান্দী' তথা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত এবং আল্লাহর কাছে নৈকট্যশীল বান্দার হওয়ার দ্বার উন্মোচন যায়। এ গুণের অধিকারী ব্যক্তির সামান্য অতি সামান্য আমলও আল্লাহ তা'আলা শানুহু-র দরবারে অনেক ভারী হয়ে থাকে, গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। পাশাপাশি পার্থিব জীবনেও এর সুদূরপ্রসারী ও গভীর প্রভাব পড়ে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পর সবচেয়ে সম্মানী ও মর্যাদাবান সত্ত্বা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যিনি সকল নবি ও রাসুলদের সরদার। যিনি খাতিমুল মুরসালিন।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিনম্রতার এই অবস্থা ছিল যে, তার বিশেষ খাদেম হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমিনে বসে যেতেন, বকরির দুধ পান করতেন এবং গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন।

আর বলতেন, যদি আমাকে এক মুষ্টি গোশতের দাওয়াত দেওয়া হয়, আমি তা গ্রহণ করব, এবং যদি আমাকে একটি ছাগলের একটি পা হাদিয়া দেওয়া হয়, আমি তাও গ্রহণ করব।' [শরহুস সুন্নাহ-বগভি]

একবার কোনো এক সফরে কয়েকজন সাহাবি একটি ছাগল জবাই করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেজন্য কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। একজন নিলেন জবাইয়ের দায়িত্ব, আরেকজনের ভাগে চামড়া আলাদা করার দায়িত্ব এবং অন্যজন পাক করার দায়িত্ব নিয়ে নিলেন।

তখন হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: রান্না করার জন্য যে লাকড়ির প্রয়োজন, তা একত্র করার দায়িত্ব আমার।

সাহাবারা আরজ করলেন: হে আল্লাহর রাসুল! এ কাজ আমরা নিজেরা করে নেব। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: একথা তো আমিও জানি যে, তোমরা তা সানন্দে করে নেবে। কিন্তু আমার পছন্দ নয় যে, আমি এই আসরের মধ্যে পৃথক থাকব, এবং আল্লাহ তা'আলাও তা পছন্দ করেন না। [আর রহিকুল মাখতুম]

আম্মাজান সাইয়্যিদা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে প্রশ্ন করা হলো যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে কী করতেন? তিনি জবাবে বললেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষদের মধ্যে একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের কাপড়ের মধ্যে ছারপোকা আছে কিনা তা নিজেই অনুসন্ধান করতেন, [যেন অন্যের কাপড়ে তা লেগে না যায়] ছাগলের দুধ দোহন করা, নিজের জামাকাপড় সেলাই করা, নিজের কাজ করা, নিজের জুতা বেঁধে দেওয়া এবং সমস্ত কাজ করতেন; যা পুরুষেরা নিজেদের ঘরে করে থাকে। ঘরের লোকদের কাজে সাহায্য করতেন এবং যখন মুয়াজ্জিন আজান দিত সাথেসাথে নামাজের জন্য মসজিদে চলে যেতেন। [সুনানে তিরমিজি]

এ হলো প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম চরিত্রের সামান্য ঝলক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিটি কাজ থেকে বিনম্রতা ও আবদিয়ত প্রকাশ পায়। নবিজির এই সুন্দর কর্মগুলো সীনা থেকে সীনার মাধ্যম হয়ে সাড়ে তেরশত বছর পরে দেওবন্দের সূর্য সন্তানদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আলোকিত তারকার ন্যায় চমকাতে দেখা যায়।

নববি সুন্নাতের সম্পূর্ণ নমুনা ওইসকল পবিত্র গুণগুলোতে গুণান্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে পুরোপুরি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম-এর মহৎ চরিত্রের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে প্রমাণ করেছেন যে, কারা আশেকে রাসুল আর কারা গোস্তাখে রাসুল?

প্রিয় নবিজির প্রিয় সাহাবিদের পর উলামায়ে হকের মধ্যে সূর্যের ন্যায় আলোকিত নাম হচ্ছে উলামায়ে দেওবন্দের নাম। দেওবন্দি আকাবিরদের যার দিকেই খেয়াল করবেন তাকেই অনুপম মনে হবে।

হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর মৃত্যু হলে লাহোরে তার স্মরণে শোকসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য দেয়ার সময় প্রাচ্যের কবি কত সুন্দরই না বললেন:

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پے روتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

তারপর বললেন, ইসলামের শেষের পাঁচশ' বছরের ইতিহাস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরীর মতো ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দেখাতে অপারগ। এমন উচ্চ পর্যায়ের আলেম ও মহান ব্যক্তি আর জন্মাবে না।

যদিও বাস্তবতা হলো, প্রাচ্যের কবির একমাত্র উদ্দেশ্য হযরত কাশ্মীরীই ছিলেন না, হযরতের শিক্ষক, ছাত্র ও সমসাময়িক সবাই ছিলেন। নিচে দেওবন্দ বাগিচার কিছু ফুলের সুগন্ধি নমুনা হিসেবে পেশ করা হবে। এই সকল মহান ব্যক্তিদের জীবনী সবসময় অধ্যয়ন করে রাহে আমল বেছে নেওয়া প্রয়োজন। এই পবিত্র ব্যক্তিদের কর্মগুলো সামনে থাকলে আমাদের জন্য রাহে আমল থেকে পালিয়ে যাওয়া যাতে সম্ভব না হয়।

হযরত মাওলানা মামলুক আলি নানুতভি রহ.

তিনি ছিলেন মাওলানা ইয়াকুব নানুতভি রহ.-এর সম্মানিত পিতা এবং হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গুহি ও হযরত কাসেম নানুতভি রহ.-এর উস্তাদ। তিনি ছিলেন নম্র স্বভাবের অধিকারী, সদাচারী, মুত্তাকি ও পরহেজগার, ইবাদতগোযার এবং সরল প্রকৃতির মানুষ। দেখে মনে হতো, প্রবৃত্তি কখনোই তার কাছে ঘেষতে পারেনি।

তাঁর ঘটনা হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. 'কাসাসুল আকাবির'-এর মধ্যে লিখেছেন। তিনি লিখেন যে, মামলুক আলি রহ. সবসময় দিল্লি আসাযাওয়া করতেন। যখন কান্ধালা অতিবাহিত করতেন তখন গাড়ি বাইরে রেখে সাক্ষাত করতে আসতেন। মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব প্রথমে জিজ্ঞেস করতেন, খানা খেয়েছেন নাকি খাবেন? যদি বলত, খেয়ে নিয়েছি তাহলে তো ঠিক আছে অন্যথায় যদি না খেতেন তাহলে বলে দিতেন, আমি খাবো। মাওলানা জিজ্ঞেস করতেন, যা রাখা আছে তাই দেবো নাকি নতুন করে রান্নাকরে দেবো?

সুতরাং তিনি একবার বললেন: যা রাখা আছে তাই নিয়ে আসো। ওই সময় শুধুমাত্র খিচুড়ির পরিত্যক্ত অংশ ছিল। তাই নিয়ে এলেন। আর বললেন এটাই তো রাখা আছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, এটাই যথেষ্ট। অতঃপর যখন তিনি চলে যেতেন তখন মাওলানা মুযাফফর হুসাইন সাহেব রহ. তাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন। সবসময় এমনই করতেন। [সিরাতে ইয়াকুব ওয়া মামলুক: ৩৪-৩৫]

সুবহানাল্লাহ! সরলতা, অকপটতা, উত্তম আচরণের কী একটি প্রাণবন্ত চিত্র? হযরত মাওলানা মুযাফফর হুসাইন কান্ধলভি রহ.-এর আন্তরিকতা ও কোনো ধরনের কৃত্রিমতা ছাড়াই খিচুড়ির অবশিষ্টাংশ পেশ করা এবং মামলুক আলি সাহেব তা কোনো বিরক্তি ছাড়াই হাসিমুখে কবুল করে নেওয়া, কত সুন্দর জীবন পদ্ধতির দিকে পথ দেখায়; যার মধ্যে শান্তি আর শান্তি।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভি রহ.

তিনি খুব হাসিখুশি এবং সদালাপী, একাকী, প্রায়শই নীরব ছিলেন, তাই যে কাউকে কিছু বলার সাহস ছিল না। সম্মানিত হতে খুব ভয় পেতেন, সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলেন। কেউ মৌলভি ডাকুক পছন্দ করতেন না। নাম নিয়ে ডাকলেই তিনি খুশি হতেন। [বিস বড়ে মুসলমান: ১১৭]

একবার হযরত নানুতভি রহ. কোথাও যাচ্ছিলেন। জনৈক তাঁতি হযরতে সরলতার সুযোগে তাকে নিজের গোত্রের লোক মনে করে বসে জিজ্ঞেস করল: "সুফিজি! আজকাল সুতার দাম কেমন?"

হযরত কোনো বিরক্তি না দেখিয়েই বললেন: "ভাই! আজ বাজারে যাইনি। তাই জানা নেই, দাম কেমন।" [ইসলাহী মাযামিন: ৫২]

মৌলভি আমির উদ্দিন সাহেব রহ. বলেন: "একবার ভুপালে মাওলানা সাহেবে পাঁচশ' রোপী মাসিক বেতনে চাকরীর প্রস্তাব আসে। আমি বললাম: 'হে কাসেম! তুমি যাচ্ছ না কেন?' তখন সে বলে: 'তারা আমাকে সাহেবে কামাল মনে করে ডেকে নিতে চাচ্ছে। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে পাঁচশ' রুপী দিবে। কিন্তু আমি তো আমার নিজের মধ্যে কোনো কামালত দেখি না। তাহলে কোন হিসেবে আমি যাব?' আমি অনেকবার জোরাজুরি করলে গেল না।" [ইসলাহী মাযামিন: ১৫৯]

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতভি রহ.

হযরতের একটি ঘটনা রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে নিজ বাড়িতে গিয়ে খাওয়ার দাওয়াত দিলো, আর তিনি কবুল করে নিলেন। ওই লোকটির গ্রাম অনেক দূরে ছিল। কিন্তু সে হযরতের যাওয়ার জন্য কোনো সওয়ারির বন্দোবস্ত করেনি। যখন খানার সময় চলে আসলো, হযরত পায়ে হেটে রওনা হয়ে গেলেন। অন্তরে এই খেয়ালটাও আসলো না যে, লোকটি তার বাড়িতে যাবার কোনো সওয়ারির বন্দোবস্ত করে দেয়নি। সওয়ারির বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল।

যাইহোক তার বাড়িতে পৌঁছে খাবার খেলেন এবং কিছু আমও খেলেন। এরপর তিনি যখন ফিরে আসা শুরু করেন, তখনও লোকটি যাত্রার কোনো ব্যবস্থা করেনি।

উল্টো সে আরেকটি আশ্চর্যজনক কাজ করল। অনেকগুলো আম পুটলিতে ভরে হযরতের হাতে তুলে দিয়ে বলল: 'হযরত! কিছু আম বাড়ির লোকদের জন্য নিয়ে যান।' আল্লাহর ওই বান্দা খেয়ালও করেনি যে হযরতকে এতদূর যেতে হবে, অথচ সওয়ারির কোনো ব্যবস্থা নেই, কীভাবে এতবড় পুটলি নিয়ে যাবে?

লোকটি পুটলিটি মাওলানাকে দিয়ে দিলেন আর মাওলানা সরলমনে হাদিয়া হিসেবে তা গ্রহণ করে নিয়ে উঠিয়ে চলতে শুরু করলেন। এখন অবস্থা হলো সারাজীবন মাওলানা সাহেব এত বড় বোঝা বহন করেননি। রাজপুত্রের মতো জীবন অতিবাহিত করেছেন। সুতরাং এই পুটলি তিনি কখনো এক হাতে উঠাতেন

কখনো আরেক হাতে নিয়ে চলতে থাকলেন। এক পর্যায়ে যখন তিনি দেওবন্দের কাছে চলে আসলেন তখন হাত দুটো ক্লান্ত হয়ে গেল, এই হাতেও শান্তি নেই, ওই হাতেও শান্তি নেই। অবশেষে পুটলি উঠিয়ে মাথায় রেখে দিলেন।

মাথায় রেখে দেওয়ায় হাতে কিছুটা আরাম অনুভূত হলো। আর বলতে লাগলেন: আমিও আশ্চর্য মানুষ। প্রথমে খেয়ালই আসেনি যে, পুটলিটা মাথায় রাখবো। যদি এমন হতো তাহলে তো এত কষ্ট পোহাতে হতো না।

এখন হযরত দেওবন্দে প্রবেশ করছেন আর তাঁর মাথায় আমের পুটলি। রাস্তায় মানুষেরা সালাম দিতে থাকল আর মুসাফাহা করতে লাগল। হযরত এক হাতে মাথার পুটলি সামলে নিতেন আরেক হাতে মুসাফাহা করতে থাকলেন। এই অবস্থাতেই তিনি নিজ ঘরে প্রবেশ করেন। অথচ তার সামান্য এই খেয়ালও আসলো না যে, এই কাজ আমার মর্যাদা ও শানের খেলাফ আর আমার পদমর্যাদার নিচে। যাইহোক! ব্যক্তির কোন কাজকে তার পদমর্যাদা থেকে নিকৃষ্ট মনে করা উচিত নয়, এটি বিনয় ও নম্রতার আলামত। [ইসলাহী খুতুবাত: ৩/৪৩]

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.

হযরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. বলেন: একবার হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেবের কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, 'হযরত আমাকে এমন অজিফা বলে দিন, যা আমল করলে স্বপ্নে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জিয়ারত নসিব হয়ে যায়।' হযরত বললেন: 'আপনার আশা আকাঙ্ক্ষা তো বিরাট! অথচ আমরা তো এর যোগ্যও নই যে, রওজায়ে মোবারকের গম্বুজ শরিফ জিয়ারত নসিব হবে।'

আল্লাহু আকবার! কী পরিমাণ ভগ্নতা ও বিনম্রতা তার মধ্যে ছিল। হযরত থানভি রহ. হযরতের এই কথার পর বলেন যে, এ কথা শোনার পর আমাদের চোখ খুলে গেল। হযরতের আজিব শান ছিল, তিনি এই ফনের ইমাম ছিলেন। প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে হিকমত টপকে পড়ত। এটিই ছিল কারণ যে, হযরতের খাদেমদের মধ্যে কেউ বঞ্চিত থাকেনি। সবার ইসলাহ ও তরবিয়ত তার অবস্থা অনুযায়ী করে দিতেন। [মালফুযাতে হাকিমুল উম্মাত: ১/৯২]

একবার কথার ধারাবাহিকতায় হযরত থানভি [রহ.] বলেন: মাওলানা হুসাইন সাহেব এলাহাবাদি রহ.-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি হাজী সাহেবের মধ্যে কী দেখতে পেলেন, যার ওপর ভিত্তি করে তার সাথে খাদেমানা সম্পর্ক কায়েম করে নিলেন? তিনি বললেন, 'তার দরবারে কিছু দেখিনি এ কারণেই তো তার সাথে সম্পর্ক কায়েম করেছি।' অর্থাৎ, বানোয়াট বা কৃত্রিম কোনো বিষয় দেখিনি। কি সুন্দর জবাব দিলেন। বাস্তব কথা হলো, আমাদের বুযুর্গদের মধ্যে এমন বিষয়ের কোনো নাম ও নিশানা পর্যন্ত ছিল না। খুবই সহজ সরল এবং সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন তাঁরা। অন্যদের দেখানোর কোনো ভনিতা ছিল না। এটাই ছিল পছন্দনীয় বিষয়। [মালফুযাতে হাকিমুল উম্মাত: ২/৩৩৬]

ইমামে রব্বানি হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহি রহ.

শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. বলেন: "হযরত গঙ্গুহি রহ.-এর ব্যাপারে মাওলানা আশেক ইলাহি সাহেব লিখেন যে, প্রকৃত বিনয় ও নফসের নম্রতা ইমামে রব্বানির মাঝে যেমন পাওয়া যায় অন্য জায়গায় ততটা দেখা যায় না। আসল কথা হলো তিনি নিজেকে সবচেয়ে নগন্য মনে করতেন, তাবলীগের কাজ হিসেবে যে মহান খেদমত তার সোপর্দ করা হয়েছিল; অর্থাৎ মানুষকে দীনের পথে হেদায়াত করা, সঠিক পথ দেখিয়ে দেওয়ার কাজ আঞ্জাম দিতেন, বায়আত করতেন, জিকির-আজকারের সবক বাতলে দিতেন, অন্তরের খারাপ গুণ ও রোগগুলো শনাক্ত করে রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বাতলে দিতেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো তাঁর অন্তরে এই ওয়াসওয়াসা আসেনি যে, আমি একজন আলেম আর এরা জাহেল, আমি একজন পির আর এরা মুরিদ, আমার স্তর এদের চেয়ে ওপরে।

কেউ কখনো শোনেনি যে, তিনি স্বীয় খাদেমদেরকে খাদেম হিসেবে অথবা নামবিহীন ডাকতেন। বরং সবসময় তিনি নিজের লোকদেরকে নামে ডাকতেন এবং দুআর মধ্যে মুরিদদের চেয়ে বেশি তাদের কথা প্রকাশ করতেন। একবার তিন ব্যক্তি বায়আত হওয়ার জন্য হযরতের দরবারে উপস্থিত হলো। হযরত তাদেরকে বায়আত করলেন আর বললেন: "তোমরা আমার জন্য দুআ করো

আমি তোমাদের জন্য। কারণ কোনো কোনো মুরিদ পিরকেও ছাড়িয়ে যায়।"
[আপবিতী: ২/২৪১, তাযকিরাতুর রশিদ এর হাওয়ালা: ২/১৭৪]

শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ.

মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মুফতি শফি সাহেব রহ. লিখেন: "আমার বয়স তখন পনের বা ষোল বছর হবে। দারুল উলুমের পুরাতন বিল্ডিং নওদারা ভবনের পিছনে বিশাল একটি দারুল হাদিস নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাই নওদারার বিল্ডিংয়ের সাথে লাগোয়া পাশেই গভীর ভিত্তি খোদাই করা হয়। আচানক ভারী বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বর্ষণ জারি থাকে। এই জমিটি কিছুটা ঢালে ছিল, আর বৃষ্টির কারণে সমস্ত ভিত্তি বৃষ্টির পানিতে ভরে গিয়েছিল। সুতরাং দারুল উলূমের প্রাচীন ভবন হুমকির মুখে পড়ে যায়। ফায়ার বিগ্রেড ইঞ্জিনের যুগ ছিল না তখন আর থাকলেই এক ছোট শহরে কোথায়?

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-কে এই অবস্থার কথা জানানো হলে তিনি তাঁর ঘরের যত বালতি ও পানি বহন করার মতো পেয়ালা ছিল সব বের করে নিয়ে আসেন। সবগুলো জমা করে হযরতের বাড়িতে যেসব তালিমে ইলম এবং মুরিদ ছিল তাদেরকে সঙ্গে করে পানি ভর্তি গভীর ভিত্তির স্থানে পৌঁছে গেলেন এবং নিজ হাতে পানি ভরে ভরে বাহিরে বের করতে শুরু করে দেন।

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর এই কাজের সংবাদ পুরো দারুল উলুম দেওবন্দে বিদ্যুতের ন্যায় ছড়িয়ে গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করার আর কী প্রয়োজন, সকল শিক্ষক এবং তালেবে ইলম এবং আসাযাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ পাত্র বা পেয়ালা নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায় এবং পানি বের করতে শুরু করে।

আমি অধমও শক্তি ও অবস্থা মোতাবেক সেই কাজে শরিক ছিলাম। দেখতে পেলাম কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভিত্তির সমস্ত পানি বের করে ফেলা হয়, আর শেষে কাঁদা থেকে যায়। অতঃপর সেই কাঁদাগুলোও বালতি দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা হয়। এরপর তিনি পাশের একটি পুকুর পরিদর্শন করেন এবং তালিবে ইলমদের বলেন যে, সেখানে গোসল করবেন। হযরত রহ. ছোটবেলা থেকেই তিনি সৈনিকের মতো জীবন কাটিয়েছেন। পানিতে সাঁতার জানা ছিল। হযরতের সাথে

ছাত্ররা যারা সাঁতার কাটতে জানত, তারা সাঁতরে মাঝখানে পৌঁছে যায়। আমার মতো যারা সাঁতার জানত না তারা কিনারায় দাঁড়িয়ে গোসল করে।

আমি তো আমি নিজে দেখেছি যে, ভ্রমণ ও শিকার ইত্যাদিতে ছাত্রদের সাথে কোনো দ্বিধা সংকোচ না করে দৌঁড়াদৌড়ি করা, পুকুর-সরোবর ইত্যাদিতে সাঁতার কাটা এমন মামুলি জীবনযাপন ছিল। তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা আমি বন্ধু-বান্ধব এবং বুযুর্গদের কাছ থেকে শুনেছি। তাদের মধ্যে কে শিক্ষক আর কে ছাত্র তা দর্শকরা চিনতে পারত না। [চান্দ আযিম শখসিয়্যত: ১১]

মুফতিয়ে আযম দারুল উলুম দেওবন্দ আযিযুর রহমান রহ.

হযরত মাওলানা মনযুর নুমানি রহ. লিখেন: "হযরত মুফতি সাহেব পদমর্যাদা ও দায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতিয়ে আকবর (পরবর্তী পরিভাষায় সদরে মুফতি) ছিলেন। তাফসীর অথবা হাদিসের কোনো কোনো সবকও পড়িয়ে দিতেন। পাশাপাশি তিনি নকশবন্দি মুজাদ্দেদি তরিকার সাহেবে এরশাদ শায়খও ছিলেন। হযরত শাহ আবদুল গনি মুজাদ্দেদি রহ.-এর খলিফা হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন দেওবন্দি রহ.-পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে সুলুক ও তরিকতের পথে চলেছেন এবং তাঁরই ইজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের তৎকালীন সময়ের আকাবির ও আসাতিযাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এমনকি সবার বড় ছিলেন এবং সবাই তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখত।

হযরত মুফতি সাহেবের মধ্যে যে পরিপূর্ণতা ও কামালত ছিল অত্যন্ত বিশেষভাবে, যা আমাদের মত শুধু বাহ্যিক চোখওয়ালারাও দেখতে পেত তা ছিল তাঁর চরম নিঃস্বার্থতা। মনে হতো, আল্লাহর এই বান্দার মধ্যে নফস নামক জিনিসটি নেই।

তার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল যে, ঘরের যেসব কাজ চাকর-চাকরানীরা করত হযরত মুফতি সাহেব প্রয়োজনের সময় ওইসব কাজ নির্দ্বিধায় করে নিতেন এমনকি তা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। যেমন, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, থালা বাসন ঘষেমেজে পরিষ্কার করা ইত্যাদি সব কাজ। আশপাশের দরিদ্র পরিবারের এক পয়সা দুই পয়সার বাজার সদাই নিজে গিয়ে বাজার থেকে কিনে এনে দিতেন। অন্যের ছেঁড়া জুতা নিয়ে গিয়ে মেরামত করিয়ে আনতেন। আমি কসম করে বলতে পারি, বিনয়

ও নিঃস্বার্থতার এমন দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও আমি দেখিনি। [তাহ্দীসে নেআমত: ১২৭]

হযরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ.

মুফতিয়ে আজম পাকিস্তান হযরত মুফতি শফি সাহেব রহ. বলেন: "আসল বিষয়টি এই যে, দেওবন্দের আলেমদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ছিল যে, নিজেদের আমিত্বকে মিটিয়ে দেওয়া, নিজেদেরকে বড় কিছু মনে না করা। আমি থানাভবনে হাজির হয়েছিলাম। হযরত থানভি রহ.-কে আল্লাহ তা'আলা এক মহিমা, এক প্রভাব দান করেছিলেন। হযরতের চেহারা বড়ই প্রভাবশালী ছিল। তিনি তা গোপন করার ইচ্ছা করলেও তা গোপন থাকত না। কিন্তু এত কিছুর পরেও তালিবে ইলম ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে মিলেমিশে থাকতেন। একবার আমি মাগরিবের পর দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি কোর্তাবিহীন শুধু পাজামা পরা অবস্থায় হাউজের পাশে চাটাইয়ের মধ্যে শোয়া আছে। আমি এদিকওদিক ঘুরাঘুরি করছিলাম অথচ আমার জানা ছিল না যে, হযরত ওয়ালা শুয়ে আছে, পাশে তালিবে ইলমও আছে। পরবর্তীতে জানা গেল যে, হযরতওয়ালা শুয়ে আছেন।

এ সকল মহান ব্যক্তিদের শান এমন ছিল। এ বিষয়গুলো দুনিয়াতে বিরল ও দুষ্প্রাপ্য। এই বিশেষ গুণ আল্লাহ তা'আলা আমাদের বুযুর্গদের দিয়েছিলেন। আফসোস! ওই সকল বুযুর্গদের সোহবত আজকাল আর বাকি নেই। শুধুমাত্র মাদরাসা ও কিতাবাদি রয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যেও এ গুণগুলো পয়দা করে দিন আমিন।" [মাজালিসে মুফতিয়ে আযম: ৫২৬]

হযরত থানভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর রুটিন ছিল যে, তিনি সাধারণ ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন, কোনো ব্যক্তি আমার পিছনে যেন না চলে এবং আমার সাথেও যেন না চলে। আমি যখন একাকী কোথাও যেতে চাই তখন আমাকে একা যেতে দেওয়া হয়।

অনুসৃত ব্যক্তির মতো এভাবে শান বানানো পছন্দনীয় নয় যে, ডানে দুই ব্যক্তি চলবে আর দুই ব্যক্তি তার বাম দিকে চলবে। যেভাবে একজন সাধারণ মানুষ চলে অনুরূপ চলা উচিত।

একবার তিনি ঘোষণা দিলেন, আমি যদি নিজ হাতে কোনো জিনিস উঠিয়ে তারপর যাই তখন যেন কেউ এসে আমার হাত থেকে সেই জিনিস না নিয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে আমাকে যেতে দেবে। মানুষের আলাদা কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেন না থাকে এমনভাবে থাকো। [ইসলাহি খুতুবাত: ৫/৩২]

শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি রহ. বলেন যে, ইউপিতে আমার এক জায়গায় বক্তব্য ছিল। রাতের তিনটায় বক্তব্য শেষ করে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, কেউ আমার পা টিপে দিচ্ছে। আমি ভাবলাম মানুষ এভাবে পা টিপে দিয়ে থাকে, আমার কোনো মুখলিস হবে হয়ত। পরবর্তীতে বুঝতে পারলাম এই হাতের মুষ্ঠি তো ভিন্ন রকমের। আরাম পাবার পরেও ঘুম চলে গেল। মাথা, উঠিয়ে দেখলাম, হযরত মাদানি। সাথে সাথেই চারপায়া থেকে নিচে নেমে এলাম এবং লজ্জিত হয়ে আরজ করলম, হযরত! আমরা কি জাহান্নামে যাওয়ার পথ পূর্ব থেকে কম করে রেখেছি যে, আপনিও আমাদের ধোঁকা দিয়ে জাহান্নামে পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন?

হযরত জবাবে বললেন, আপনি দীর্ঘসময় পর্যন্ত বয়ান করেছেন, আরামের প্রয়োজন ছিল আর আপনার অভ্যাসও আছে, আর আমার সৌভাগ্যশীল হওয়ার প্রয়োজন, তাছাড়া নামাজের সময়ও নিকটে ছিল, তাই ভাবলাম যে, আপনার নামাজ যেন চলে না যায়। তাহলে বলুন! আমি গলত কিছু করেছি? [বিস্ বড়ে মুসলমান: ৫১৫]

মাওলানা আবদুল্লাহ ফারুকী রহ. হযরত রায়পুরি রহ.-এর কাছে বায়াতবদ্ধ ছিলেন। লাহোরের দিল্লি মুসলিম হোটেলে বহু বছর খতিব ছিলেন। তিনি বলেন: আমি মদিনা মুনাওয়ারায় গেলাম এবং হযরত মাওলানা মাদানি রহ.-এর কাছে অবস্থান করলাম। একদিন মাওলানা সাহেবের সাথে যখন মসজিদে নববিতে নামাজ পড়তে গেলে, আমি মাওলানা সাহেবের জুতা উঠিয়ে নিলাম। মাওলানা সাহেব তখন খামোশ রইলেন। দ্বিতীয়বার যখন নামায পড়ার জন্য গেলেন তখন মাওলানা সাহেব আমার জুতা উঠিয়ে মাথায় রেখে দিলেন। আমি পেছন পেছন দৌড় দিলাম। মাওলানা সাহেব দ্রুত চলতে শুরু করলেন। আমি জুতা নেওয়ার

চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি দিলেন না। আমি বললাম: আল্লাহর ওয়াস্তে জুতা মাথায় রাখবেন না। তিনি বললেন: তাহলে অঙ্গীকার করো যে, ভবিষ্যতে কখনো হোসাইন আহমাদের জুতা উঠাবে না। আমি অঙ্গীকার করে নিলাম, তখন জুতা মাথা থেকে নিচে নামিয়ে রাখলেন। [বিস বড়ে মুসলমান: ৫১৬]

এখানে মহান ব্যক্তির সামান্য ও সংক্ষিপ্ত নমুনা পেশ করা হলো। অন্যথায় উলামায়ে দেওবন্দের চারণভূমি তো এমন বিস্তৃত, সৌরভময় এবং ফলদার; সমগ্র দুনিয়া যাদের থেকে ফয়জ ও বরকত গ্রহণ করছে এবং গ্রহণ করতে থাকবে।

এরা ছিলেন মহান ব্যক্তি; যারা প্রিয় নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইলম ও আমলকে স্বীয় অন্তরে ধারণ করে দিনরাত তা পালন করতেন, প্রতিটি কাজের সাথে সম্পর্কিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নত বুকে ধারণ করে তা সবার কাছে পৌঁছে দিতেন।

এই গুলিস্তানের প্রতিটি ফুলের ইতিহাস নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং হতে থাকবে ভবিষ্যতে। প্রয়োজন হলো, এই মহান ব্যক্তি জীবনী সবসময় অধ্যয়ন করা এবং তাদের পবিত্র গুণাবলী অবলম্বন করা। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই মহান ব্যক্তিদের গুণাবলি অবলম্বন করে তা ছড়িয়ে দেওয়ার তাওফিক দান করুন।[৪৫]

---

৪৫ সূত্র: মাহনামা আল-বাইয়িনাত

আধুনিক যুগে আকাবিরে দেওবন্দের ইলম ও মারেফতের গুরুত্ব

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসআব [মুঈনে মুফতি, দারুল উলুম দেওবন্দ]

নিকট অতীতকালে এমন মহান কিছু ব্যক্তি অতিবাহিত হয়েছেন; যারা ছিলেন খায়রুল কুরুনের স্মৃতি স্তম্ভ, সালাফে সালেহীনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ, ইলম ও যোগ্যতার পাশাপাশি ইনাবত ইলাল্লাহ, ইসলাহ ও তাকওয়া, দীনি সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতা, সরলতা, বিনম্রতা, আত্মোৎসর্গ ও লিল্লাহিয়তের মতো গুণাবলির আধার। প্রতিটি ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, দীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সতর্ক এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন, মেজাজ ও মননে স্বচ্ছতা অবলম্বন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 'আকাবিরে দেওবন্দ' নামে স্মরণ করা হয়।

দেওবন্দি মাসলাক এমন কোনো ধর্মীয় ফিরকা বা উপদল নয়; যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত থেকে বের হয়ে আলাদা কোনো পথ অবলম্বন করেছে। আকাবিরে দেওবন্দ নতুন কোনো ফিরকার বুনিয়াদ স্থাপন করেননি। বরং জমহুর উম্মত যে আকিদা বিশ্বাসের প্রবক্তা এবং যেসব আমলের ওপর চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে, উলামায়ে দেওবন্দ ঠিক সেসব আকিদা বিশ্বাস ও আমলের পাবন্দি করে। তারা পবিত্র কুরআন ও নবিজির সুন্নাহের ইনসাফপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যার প্রবক্তা, যা চৌদ্দশত বছর ধরে উম্মাহর উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে। যদি তারা কখনো কুরআন ও হাদিসের উপর কোনো আঁচ আসতে দেখতেন, তবে তারা অবশ্যই প্রজ্ঞা ও অধ্যবসায়ের সাথে তা দূর করার চেষ্টা করতেন। [ইয়াদে-প্রথম কিস্তি]

আকাবিরে দেওবন্দের ইলম ও মারেফত এবং মানব জগতের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠাপূর্ণ সর্বাত্মক সেবার প্রভাব আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও দৃশ্যমান। তাদের খেদমতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত কথায় উপস্থাপন করা যেতে পারে।

যেভাবে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের সংশয়ের উসুলভিত্তিক প্রশংসামূলক জবাব প্রদান করেছেন এবং বহিরাগত আক্রমণ থেকে ইসলামকে হেফাজত করার জন্য ফসিল তৈরি করে তার দূর্গ মজবুত ও দৃঢ় করেছেন অনুরূপ ইসলামের অভ্যন্তরীণ কাঠামোকেও হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন এবং

মুসলমানদের সন্দেহ-সংশয় এবং বস্তুবাদের কারণে তাদের মনের মধ্যে যে সমস্যাগুলো বিকাশ লাভ করেছিল তার সম্পূর্ণ প্রতিকার করেছেন।

আর পূর্ণ দৃঢ় প্রত্যয় ও অভিজ্ঞতার সাথে বলা ও লেখা যায়, আকাবিরে দেওবন্দ থেকে উদ্ধৃত জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ইসলামি শিক্ষার ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে মধ্যপন্থাভিত্তিক। যার মধ্যে তাদের শুদ্ধতম অভিরুচি ও নিরেট উত্তম স্বভাব অনুভব করা যেতে পারে।

আকাবিরে দেওবন্দের ইলম ও মারেফাতের গুরুত্ব ও তাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি দিতে হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ.-এর উদ্ধৃতিটি নজরকাড়া। হযরত থানভি রহ. বলেন: আমাদের আকাবিরদের মালফুযাত ও গবেষণা দেখে নাও। জানতে পারবে, এই যুগেও ইমাম রাযী ও গাযালী বিদ্যমান। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, (ইমাম রাযী, ও গাযালী) তাদের যুগ এখনকার মতো ফিতনাময় ছিল না এবং খারাপ ছিল না। এগুলো মহান ব্যক্তিদের রচনা ও গবেষণা দেখে জানা যেতে পারে। কিন্তু তা দেখে কে? [মালফুযাতে হাকিমুল উম্মাত: ৮/১৩]

বর্তমান যুগে ইসলামের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং তাতে প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের মন-মস্তিষ্কে সে দ্বিধা সংশয় তৈরি হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে আকাবিরে দেওবন্দের বক্তব্যের আলোকে সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা যায় এবং মুখলিস মুসলমানদের সংশয়কে দূর করে অনেকাংশে সন্তুষ্ট করা যায়।

এ ব্যাপারে হযরাত আকাবিরে দেওবন্দের লিখিত রচনাবলি স্থায়ী প্রতিক্রিয়াশীল এবং যথেষ্ট সক্রীয় প্রকৃতির।

যা পড়লে ইসলামের সত্য ও চিরন্তন অবস্থা জানা যায় এবং হৃদয়ের জটগুলো যেভাবে খুলে যায় তা পাঠক নিজেই অনুভব করতে পারে। কিন্তু তা কথা ও বাক্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করা মুশকিল।

বর্তমান যুগে আকাবিরে দেওবন্দের এই দিকটি সবার সামনে তুলে ধরা এ জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, সংশয়বাদের প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার জন্য যেসব লেখা

বর্তমানে সামনে আসছে তাতে দায়সারা ব্যাখ্যা, সম্মোহিত মানসিকতা, প্রচলিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভাব এবং প্রচলিত চিন্তাধারার চাপ অনুভব করা যায়।

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতভি রহ.-এর রচনাবলির ব্যাপারে লিখেন:

"তালিবে ইলম ও ইসলামের ধারকবাহকদের খেদমতে আমার আরয, ইসলামের বিধান নিশ্চিতকরণ ও প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনের প্রতিরোধকল্পে যে চেষ্টা সাধনা করা হচ্ছে সেগুলো আপন অবস্থায় রেখে হযরত খাতিমুল উলামার রিসালাগুলো মুতালাআয় কিছু সময় অবশ্যই ব্যয় করুন এবং সম্পূর্ণ চিন্তা ফিকির করে ইনসাফের সাথে দেখুন, বর্তমান প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন মোতাবেক ওইসব চেষ্টার চেয়ে ফলদায়ক, সংক্ষিপ্ত ও উপকারী কিনা?" [হুজ্জাতুল ইসলাম: ১৬-১৭]

সংক্ষিপ্ততার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বর্তমান যুগের আলোচিত বিষয়ের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ.-এর শুধুমাত্র একটি উদ্ধৃতি নকল করছি। পাঠকদের প্রতি আরয, এই উদ্ধৃতিটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন এবং অনুমান করুন আকাবীরে দেওবন্দ দীন ও শরিয়তের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কেমন এবং আত্মবিশ্বাস ও মাসলাকের ব্যাপারে কেমন কঠোর ছিলেন।

এক প্রশ্নকর্তা পর্দার মাসআলায় নিজে চিন্তা ভাবনা করে হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ.-এর কাছে এসে প্রশ্ন করেছিল। যার বিস্তারিত জবাব লিখেছিলেন। ওই জবাবের প্রথম উদ্ধৃতি দেখুন:

عزیز من!

اس وقت بہ نظر تحقیق کسی امر میں غور کرنے کے لیے دو شرط کی ضرورت ہے: اوّلاً وہ امر دقیق اور نظری ہو؛ کیوں کہ اگر بدیہی اور واضح ہے تو غور محض بے کار ہے۔ ثانیاً ہم لوگوں سے پہلے ہم سے بڑے درجہ کے لوگوں نے جو قوتِ علمیہ وتائید من اللہ اور طلبِ صادق و نظر غائر وفکر صائب اور حبِ دین اور سلامتِ طبع اور منصف مزاجی اور خوفِ خدا اور اتباعِ حق اور مجاہدۂ

نفس و مخالفتِ ہویٰ و حریتِ خالصہ وغیرہا صفاتِ جمیلہ کاملہ میں ہم سے ہزارہا درجہ بڑھے ہوئے تھے،

প্রিয় আমার!

এ সময়, কোনো বিষয়ে গবেষণার জন্য দুটি শর্ত প্রয়োজন:

প্রথমত, এটি সুনির্দিষ্ট এবং [নযরী] তাত্ত্বিক হওয়া উচিত; কারণ যদি [বদেহী] সুস্পষ্ট হয় তাহলে চিন্তা করা বেকার। দ্বিতীয়ত, আমাদের পূর্বে আমাদের চেয়ে উচ্চস্তরের লোকেরা; যাদের মধ্যে ইলমি যোগ্যতা, আল্লাহর পক্ষ থেকে সমর্থিত, তলবে সাদেক তথা ন্যায়সঙ্গত দাবি, গভীর চিন্তাভাবনা ও সঠিক চিন্তাধারা, দীনদরদী, স্বচ্ছ মনন ও ন্যায়সঙ্গত মেজাজে এবং আল্লাহর ভয় ও ইত্তেবায়ে হক, নফসের মুজাহাদা, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ, হুররিয়াতে খালেসা ইত্যাদি এসকল সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ গুণের অধিকারী তারা আমাদের চেয়ে হাজার গুণ বড়।

اس امر میں تحقیق اور کلام نہ کیا ہو اور کلام کرکے فیصل اور طے نہ کردیا ہو: کیوں کہ اگر اس درجہ کے لوگوں نے کوئی امر ثابت کردیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ امر نہایت درجہ منقح و محقق ہوگا۔ اس میں فکر کرنا ایسا ہے جیسا عام رعایا قوانین مروجہ پارلیمنٹ میں نظرثانی کرنے لگے اور اتباع واطاعت کو اپنی نظر کی رسائی پر موقوف رکھے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ایک گونہ بغاوت کا شعبہ سمجھا جائے گا۔

তারা [এসব গুণের অধিকারীরা] যেন [ইতোপূর্বে] এই বিষয়ে তাহকীক ও সমালোচনা না করে থাকেন আর সমালোচনা করে সিদ্ধান্ত না দিয়ে থাকেন। কারণ যদি এই স্তরের লোকেরা কোনো বিষয় প্রমাণিত করে দেয় প্রকাশ থাকে যে, সে বিষয়টি অত্যন্ত সংশোধিত ও গবেষণালব্ধ হবে। এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা যেমন সাধারণ প্রজারা প্রচলিত পার্লামেন্টে পাসকৃত বিধানগুলোতে নজরে সানী করতে শুরু করে এবং নিজেদের চিন্তাধারা অনুযায়ী তার অনুসরণ ও অনুকরণ করে। প্রত্যেকেই জানে, এ কাজ বিদ্রোহের একটি ধরন বলে মনে করা হবে।

اب ہم پردہ کے مسئلہ کو جو دیکھتے ہیں اس میں یہ دونوں شرطیں مفقود پاتے ہیں؛ کیوں کہ یہ مسئلہ اوّلًا نہایت بدیہی ہے؛ چناں چہ عنقریب آیات و احادیث کے ملاحظہ سے معلوم ہوگا۔ ثانیًا اس درجہ کے لوگ جو کہ باجماعِ اُمتِ مرحومہ (جس کا مرتبہ اور قوت کثرتِ آراء سے ہزارہا درجہ زیادہ ہے) مقتدائے ملت اور پیشوائے شریعت مسلّم ہو چکے ہیں، اس کو طے اور ختم کر چکے ہیں:

এখন আমরা পর্দার মাসআলা যা দেখছি, তাতে এ শর্তদ্বয় নেই। কারণ এই মাসআলা প্রথমত, অত্যন্ত সুস্পষ্ট; সুতরাং অতি শীঘ্রই আয়াত ও হাদিসের আলোকে জানা যাবে। দ্বিতীয়ত, এই মাসআলায় ওই স্তরের লোকেরা যারা উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে মুকতাদায়ে মিল্লত ও পেশওয়ায়ে শরিয়ত হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত তারা এই মাসআলার সমাধান করে দিয়েছেন।

البتہ اتنی خدمت کے لیے حامیانِ دین اور خادمانِ مذہب ہمیشہ تیار اور آمادہ ہیں کہ اگر کسی طے شدہ مسئلہ میں خواہ وہ منصوص ہو یا اجماعی اور علیٰ سبیل الترق خواہ اجتہادی ہو کسی مخالف کو اعتراض یا کسی موافق کو شبہ اور خلجان ہو، بشرطے کہ اُصولِ صحیحہ کے موافق اس کو پیش کیا جائے اور انصاف اور کسی خاص جماعت کی تقلید یا کسی خاص غرض کی اتباع سے آزادی کے ساتھ اس کا جواب سننے اور سمجھنے کا وعدہ کیا جائے تو کسی وقت یہ حامیانِ مذہب جواب دینے سے اور اس جواب کے جواب الجواب دینے سے عذر یا انکار کرنا نہیں چاہتے؛ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا کوئی ذمہ دار نہیں کہ دوسرے شخص کو ہدایت بھی ہو جائے؛ کیوں کہ یہ امر مجیب یا مصلح کے اختیار سے خارج ہے؛ ورنہ آج ساری دنیا ایک طریقہ پر نظر آتی۔ اھ

অবশ্য এতটুকু খেদমতের জন্য দীনের সাহায্যকারী ও মাযহাবের খাদেমরা সবসময় প্রস্তুত রয়েছে যে, যদি কোনো সিদ্ধান্তকৃত মাসআলা; চাই তা নসের ভিত্তিতে হোক বা ইজমায়ে উম্মতের ভিত্তিতে হোক এবং علیٰ سبیل الترق হোক বা ইজতেহাদী হোক, কোনো বিরোধীর প্রশ্নের জবাবে হোক বা কোনো সমমনা ব্যক্তির সন্দেহ সংশয় নিরসনে হোক; শর্ত হলো সঠিক উসুলের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা, ন্যায়-ইনসাফের সাথে কোনো বিশেষ দলের অনুসরণ অথবা

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে তার জবাব শোনা ও বোঝার ওয়াদা করা।

তাহলে যে কোনো সময় ধর্মের এই সহমর্মী জওয়াব দিতে এবং জওয়াবের জওয়াবুল জওয়াব দিতে উজর পেশ করবে না কিংবা অস্বীকার করবে না। কারণ এ বিষয়টি জবাবদাতা ও সংশোধনকারীর ইচ্ছার বাইরে। অন্যথায় আজ সারা দুনিয়া এক পদ্ধতির ওপর দেখা যেত। [উদ্ধৃতি শেষ হলো]

এই উদ্ধৃতির প্রতিটি শব্দ থেকে কঠোরতা, আত্মবিশ্বাস এবং ব্যাখ্যার পোক্ততা প্রকাশ পাচ্ছে। বাস্তবতা হলো যে, এই উদ্ধৃতির আলোকে সমকালীন অনেক মাসআলা সহজেই সমাধান করা যায়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আকাবিরে দারুল উলুম দেওবন্দের তাসনিফাত থেকে বেশি বেশি ইস্তেফাদা গ্রহণ করা উচিত। যেন দীন ও শরিয়তের ধারাবাহিকতায় আমরা যেন সকল বিষয়ে সন্তুষ্টি ও দিকনির্দেশনা পেতে পারি, দীন ইসলামের তরজুমানীর জন্য সঠিক ব্যাখ্যা ব্যবহার করা যায় এবং সমকালীন প্রচলিত ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও সন্দেহ সংশয়গুলো সঠিক উসুলের আলোকে দিফা করা যায়, শুধুমাত্র ধাপেধাপে নয় বরং বুদ্ধিবৃত্তিক মানদন্ড মোতাবেক ইসলামি বিধান পেশ করা যায়।

সবশেষে হাকিমুল উম্মত রহ.-এর আরেকটি উদ্ধৃত্তির প্রতি খেয়াল করুন। হযরত লিখেন:

এক ডেপুটি কালেক্টর এখানে এসে আমাকে প্রশ্ন করল, সুদের ব্যাপারে আপনার খেয়াল কী? এই প্রশ্নের ধরনও আজকালের মানুষদের মতো, 'আপনার খেয়াল কী'। আমি বললাম, আমার আবার কী খেয়াল হবে? আমি তো মুসলমান, ধর্মীয় ব্যক্তি, আল্লাহ ও রসুলের যা হুকুম সেই খেয়ালই আমার। আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

আল্লাহ তা'আলা ব্যাবসাকে হালাল করেছেন আর হারাম করেছেন সুদকে।

বলতে লাগল, অমুক দেহলভি সাহেব এই আয়াতের অন্য ব্যাখ্যা করেন। আমি বললাম, যদি তার ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে আপনারা যে আইনের মাধ্যমে ফয়সালা করে দিন, আমি ব্যাখ্যা করে দেব। তারপর আপনারা সেই ব্যাখ্যা মোতাবেক বিচার ফয়সালা করুন, যা নিশ্চিত আইনের বিপরীত হবে। তারপর যখন গভর্নমেন্ট প্রশ্ন উত্থাপন করবে তখন বলে দিবেন, এ আইনের ব্যাখ্যা অমুক ব্যক্তির ব্যাখ্যা মোতাবেক। এর বিপরীত গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যে জবাব আপনাকে দেওয়া হবে সেই জবাব আমার পক্ষ থেকে। আর আপনি যার নাম নিচ্ছেন সে কি জানে তাফসীর কাকে বলে?। [মালফুযাতে হাকিমুল উম্মত/আল ইফাদাতুল ইয়াওমিয়্যাহ: ৪/২৯৪][৪৬]

***

গ্রন্থাগার প্রকাশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

কিতাবের নাম	ক্যাটাগরি	নেট মূল্য
দুআ কবুলের সোনালি গল্পমালা	গল্প ও উপদেশ	৩০০
হিংসা করা ভালো নয়	গল্প ও উপদেশ	২০০
তাওবা গুনাহ মাফের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম	আত্মশুদ্ধি	১০০
ইন্টেলিজেন্ট তুহিন	ইসলামী আদর্শ ও মতবাদ	১৮০
লাভ রিয়েক্ট	দাম্পত্য জীবনের গল্প	১২০
যেমন ছিল মনীষীদের ছেলেবেলা	গল্প ও উপদেশ	৭৫
বেকুবনামা	গল্প ও উপদেশ	১৪০
ধূসর জীবনের ইতি	উপদেশ	১৩০
যেমন ছিল বদকারদের শেষ পরিণতি	গল্প ও উপদেশ	২০০
শিশুদের প্রতি চল্লিশ নাসিহা	উপদেশ	৭৫

৪৬ সূত্র: মাহনামা দারুল উলুম দেওবন্দ, ৫-৬ সংখ্যা, খন্ড ১০৩, রমজান-শাওয়াল ১৪৪০, মে-জুন ২০১৯

আকসার অজানা অধ্যায়	দূর্লভ তথ্যাবলি	৫০
আদর্শ মায়েদের গল্প	গল্প ও উপদেশ	৮০
কিশোরগল্পে সালাফে সালেহিন	গল্প ও উপদেশ	৬০
ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভয়াল থাবা	সমকালীন ফিতনা	৭০
ট্রান্সজেন্ডারের শরয়ী বিধান	মাসায়েল	১৩০
কুরআনি দুআ	দুআ, দুরূদ	২৫
জান্নাতি দুলহান	গল্প ও উপদেশ	১২০
সেরা গল্পে দিবারাত্রি	গল্প ও উপদেশ	৮০
যে কারণে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ	তত্ত্ব ও গবেষণা	১৩০
যে গল্পে মনুষত্ব জাগে	গল্প ও উপদেশ	১২০
ফিলিংস মানবমনে আলোর দিশা	আত্ম উন্নয়ন	১২০
আমল কম সওয়াব বেশি	আমল	৭০
যে আমলে জান্নাত মিলে	আমল ও আত্মশুদ্ধি	৭০
আদর্শ নারীদের গুণাবলি	আত্মশুদ্ধি	১৩০
যে আমল গুনাহ মিটিয়ে দেয়	আত্মশুদ্ধি	১৩০
যে আমল গুনাহ মিটিয়ে দেয়	আত্মশুদ্ধি	১৩০
আকাবিরে দেওবন্দের সোনালি অতীত	ইতিহাস	১০০
ইখলাস আমলের সৌন্দর্য	আত্মশুদ্ধি	৭০

সোনালি
গল্পমালা
লাভ
রিয়েক্ট
তাওবা
শেষ
পরিণতি

আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন? এর জবাব সংক্ষিপ্ত কথায় এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, তারা ছিলেন খায়রুল কুরুনের স্মৃতি, সালাফে সালেহিনের নমুনা, ইসলামি ভাবধারার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে বসে গেলে এর জন্য বইয়ের পর বই লিখে ফেললেও যথেষ্ট হবে না। আর সত্য কথা হলো, তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি শব্দ ও বাক্যের গাঁথুনিতে নিয়ে আসা কঠিনই নয় শুধু, বরং তা প্রায় অসম্ভব।